সব হারানোর দেশে

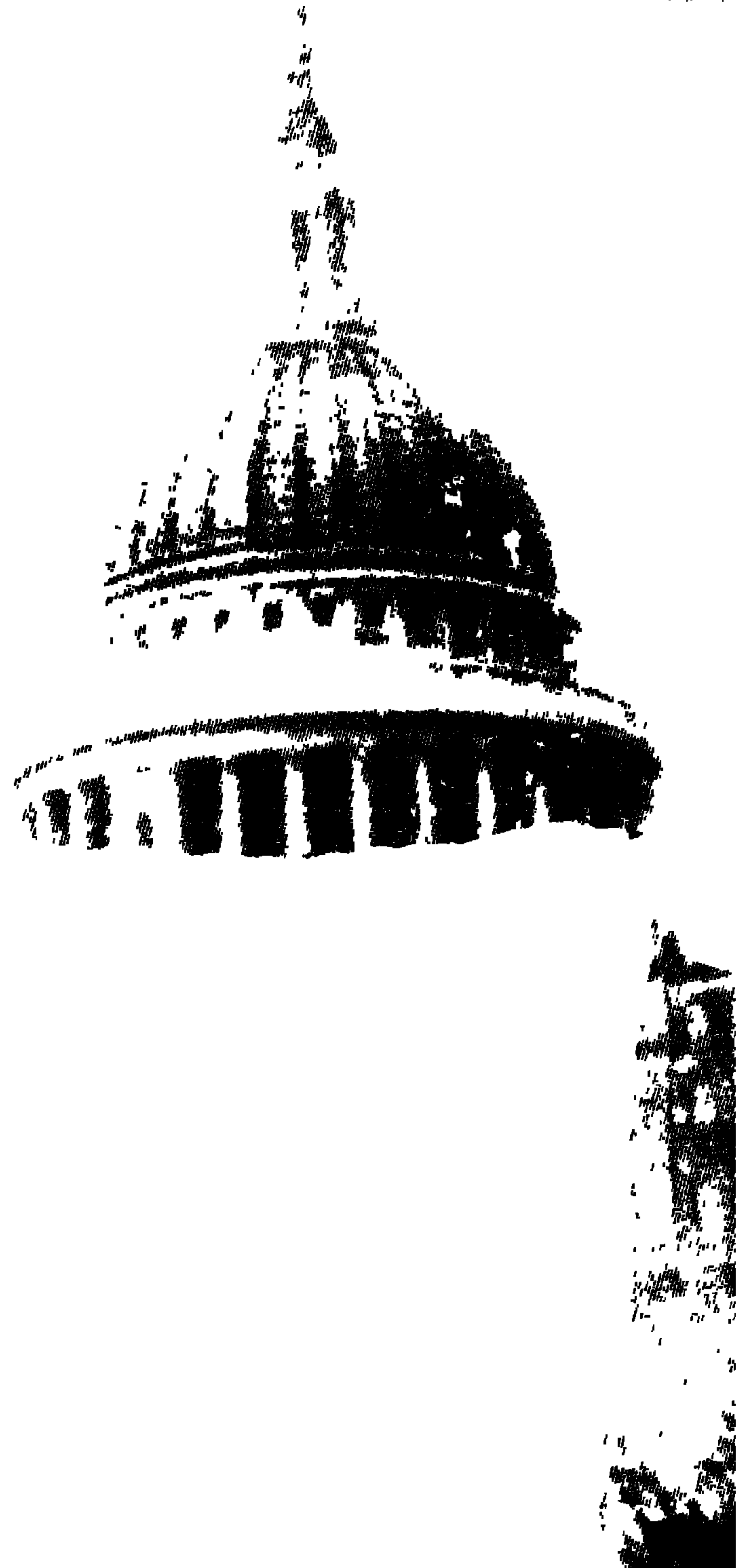

শচীন্দ্রনাথ বসু

সব হারানোর দেশে

আজকের ইংলণ্ডের কাহিনী

শচীন্দ্রনাথ বসু

BIR BIC
৭০২৪

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

একমাত্র বিক্রেতা ও পরিবেশক

দ্বিতীয় সংস্করণ
কার্ত্তিক ১৩৫৭

আড়াই টাকা

প্রকাশক ঃ
শচীন্দ্রনাথ বসু
২/২ হিন্দুস্থান রোড।
কলিকাতা।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার দত্ত
প্রিণ্টিং হাউস্
১৫৭-এ, ধর্ম্মতলা স্ট্রিট,
কলিকাতা।

১৯৪৮ সাল, ফেব্রুআরি-র শেষা-শেষি। বিকেল থেকে সেদিন হঠাৎ বরফ পড়া শুরু হল। তাড়াতাড়ি লণ্ডনের উপকণ্ঠে আমার ছোট ঘরটিতে এসে ঢুকেছি। পেঁজা তুলোর মত নরম সাদা, পাখির পালকের মত হালকা তুষার ধারা নেমে আসছে নিঃশব্দে অলস গলিতে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বেশ লাগে দেখতে। পরিচিত দৃশ্য—অথচ অনেকদিন পরে কেমন নতুন লাগছে।

অন্ধকার হয়ে এল। জানলার পর্দা টেনে দিয়ে আগুনের কাছে এসে বসলাম। জুতো খুলে মোজাসুদ্ধু পা দুটো এগিয়ে দিলাম রেডিয়েটার-এর গা ঘেঁষে। আঃ, কী সুখ! এদেশে এর চেয়ে আরামের মুহূর্ত বুঝি আর নেই। না,

রাতে যখন লেপের তলায় যেয়ে ঢুকি তখনো আরামটা এত দ্রুত টের পাওয়া যায় না। বিছানাটা মনে হয় যেন বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা, সারা অঙ্গ ছ্যাঁক করে' ওঠে ; শুধু পাএর কাছটা গরম জলের ব্যাগ-এর আওতায় উষ্ণ এবং সুখস্পর্শ। আস্তে আস্তে নিজের দেহের উত্তাপে বিছানা গরম হবে তবে একটু শান্তি। সেই গাএর-রক্ত-জল-করা গহ্বরটার আশ্রয় ছেড়ে সকালবেলা যখন বেরিয়ে আসতে হয় তখন কী প্রাণান্তকর যন্ত্রণা! কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ হয় এই মুহূর্তে—বাইরের নির্দয় পৃথিবীকে দরজার বাইরে রেখে যখন নিজের কোণটিতে এসে বসি, হাত-পাএর অসাড় আঙুলগুলি আগুনের তাপে ভাজা ভাজা হতে থাকে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, টেলিফোনের ঝংকারে চমকে' উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে যেয়ে ধরলাম যন্ত্রটা। পরিচিত নারী-কণ্ঠ বললে, 'যাক, তোমাকে পাওয়া গেল। বরফের ভয়ে আজ তাড়াতাড়ি গর্তে এসে ঢুকেছ বুঝি। শোনো, তুমি আমার কাছে দশ শিলিং ধারো সেটা মনে করিয়ে দিতে চাই।'

'কেন বল তো নর্মা?'

'ওমা, এরি মধ্যে ভুলে' গেছ। তুমি বলেছিলে এবারের শীতে আর বরফ পড়বে না, আমি বললাম পড়বেই—তাই নিয়ে হল বাজি।'

'ওহো, তা বটে। কিন্তু যাই বল, বাজিতে হারলুম বটে, তবু বেশ লাগছে বরফ পড়াতে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এতক্ষণ।'

'জানলা ভাল করে' বন্ধ করেছ তো, নয়তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'ঠাণ্ডা আমার অত চট করে' লাগে না ইংরেজদের মত।'

'বেশী বাহাদুরি করে' কাজ নেই, শেষে মারা পড়বে।'

'ভয় নেই, আমার জন্য কেউ চোখের জল ফেলবে না।'

'কী করে' জানলে?...জান আমি কী করছিলাম এতক্ষণ! কাজ অনেক ছিল কিন্তু সব ফেলে দিয়ে বিছানায় ঢুকে রেডিওতে থার্ড প্রোগ্রাম শুনছি। আধঘণ্টা ধরে' সুরসাগর ব্রাহম্‌স এবং তার ফোর্থ সিম্ফনি-র ব্যাখ্যা শুনে মনে হল, দুত্তোর!...থার্ড প্রোগ্রাম তোমার কেমন লাগে?'

'এত বেশী হাই-ব্রাউ যে আমিও মাঝে মাঝে দুত্তোর বলে' ঘরোয়া বা হালকা প্রোগ্রাম-এর চাবি টিপি।'

'আচ্ছা এবার যাই, শীত করছে। এক একবার মনে হচ্ছে জামা জুতো পরে' বেড়াতে বেরোই বরফ ভেঙে, আবার ভাবছি তার চেয়ে বিছানাই ভাল। গাএর তাপে এতক্ষণ বেশ গরম হয়েছে, ওটাকে আর জুড়োতে দে'য়া উচিত নয়, কি বল?'

'তোমার মত কুঁড়ে মেয়ে আর দুটো দেখিনি।'

খিলখিল হাসি, তারপর : 'সত্যি কথা, কিন্তু শিভালরি-র খাতিরে ওটা না-বললেও পারতে। তাছাড়া এও তো জান যে সারাদিন কাজ করি। আচ্ছা যাই, শীত করছে। ভাল ভাল স্বপ্ন দেখো আজ রাতে।'

'চেষ্টা করবো খুব। তুমি কি অর্ডার-মাফিক স্বপ্ন দেখতে পার নাকি?'

'কে জানে হয়তো চেষ্টা করলে পারা যায়। উঃ, বড্ড শীত করছে। পালাই এবার। ভুলো না কিন্তু।'

'কাকে, তোমাকে? পাগল হয়েছ—'

'না, দশ শিলিং।'

অনেকদিন পরে হঠাৎ বরফ দেখে মনে হচ্ছে যেন শীত পড়েছে প্রচণ্ড কিন্তু আসলে যারা গত শীতের অগ্নি-পরীক্ষা পেরিয়ে এসেছে তাদের কাছে এ কিছুই নয়। সে এক অভিজ্ঞতা বটে—নব্বই বছরের মধ্যে এমন দারুণ শীত পড়েনি এদেশে। সামনের মাঠে পাড়ার ছেলেরা এক প্রকাণ্ড বরফের-বল বানিয়ে রেখেছিল, সেটা গললো দেড় মাস পরে। আমাদের এ-পাড়ায় এক রাতে তাপ নেমে গেল শূন্যের নিচে সাত ডিগ্রি, অর্থাৎ যে-ঠাণ্ডায় জল জমে তারও ৩৯ ডিগ্রি নিচে। কাগজে দেখা গেল ফোক্স্টোন-এর কাছে সমুদ্র জমে' যাচ্ছে। এদিকে কয়লা নেই কোথাও—কয়লা

নেই মানে বিদ্যুতও নেই। লোকে ঘরে বসে' হিহি করে' কাঁপে, দিনদুপুরে বিছানায় যেয়ে ঢোকে। রাস্তায় আলো জ্বলে না, কুয়াশা-জড়িত অন্ধকারে জমে'-যাওয়া বরফের পিছল পথে আছাড় খেতে খেতে চলতে হয়। দিনের বেলা সকাল বিকেল ঘণ্টাকয়েক বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ, আলো পর্যন্ত জ্বালবার উপায় নেই। সে-সময়টুকুর জন্য প্রায় সব কাজই স্থগিত, কারণ শীতকালে এদেশে সারাদিনই আলো জ্বলে। আলো অবশ্য চুরি করে' জ্বালা চলতো—ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম—কিন্তু খুব কম লোকেই তা করেছে। গভর্মেন্টের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছে, ফুএল-মন্ত্রী শিনওএল সাহেবের মুণ্ডপাত করেছে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার, কিন্তু আলোর স্যুইচ-এর কাছে হাত নেয়নি।

বহু ভাগ্য যে নব্বই বছরের রেকর্ড যখন ভাঙলো ঠিক তখনি এদেশে ছিলাম। যদিও আসলে শীতের কষ্ট এর চেয়ে অনেক বেশী ভোগ করেছি প্রথম যখন আসি এদেশে। মনে পড়ে প্রথম রাত্রি। অনেক হাঙ্গামার পর আশ্রয় জুটলো এক বাড়ির সিঁড়ির তলায়। খাট পর্যন্ত নেই, কাঠের মেঝের উপর কম্বলের বিছানা—আমার এবং দুটি সঙ্গীর। কিন্তু আমাদের কাছে তখন তা-ই যথেষ্ট। সেই কোন্ সকালে জাহাজ থেকে নেমেছি, সারাদিন কেটেছে ট্রেনে, ভারি ভারি মাল বইতে হয়েছে নিজেদের কারণ যুদ্ধের বাজারে তখন

কুলি পাওয়া দুঃসাধ্য। দেহ মন ক্লান্ত, ঘুমের জন্য বিছানা না-হলেও চলে। কিন্তু বিছানায় ঢুকে কেমন অস্বস্তি বোধ হতে থাকলো; তিন দিক শক্ত করে' আঁটা একটি পকেটের মত শয্যা, শুধু গলার কাছটা খোলা—যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ইংরেজ জাতির 'অর্থহীন' এই রীতিকে অভিসম্পাত দিতে দিতে তিনজনেই দু'পাশের গোঁজা কম্বল আলগা করে' নিজেদের বন্দীদশার থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে নিলাম।

বোধহয় ঘণ্টাদুএক পরে, ঘুম গেল ভেঙে। সারাদেহ কাঁপছে শীতে, কম্বলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে' ঢুকছে ঠাণ্ডার স্রোত। মেঝেটা যেন বরফের একটা চাক। যথাসম্ভব কম্বল গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে' আছি এমন সময়ে একে একে সঙ্গী দু'জন সাড়া দিলেন। তাদেরও দুর্ভোগ আমার মত। সে-রাতটা এবং তার পরেও আরো কয়েক রাত সামান্যই ঘুমোতে পেরেছি। অথচ তখন সবে অক্টোবর,—শীতকাল শুরু হয়নি।

শীতের কয়েক মাস আবহাওয়া এদের নিয়ে নির্দয়ভাবে ছিনিমিনি খেলে। শুধু ঠাণ্ডা হলেও বাঁচা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে আছে কুয়াশা, ঝড়, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষারবৃষ্টি—এবং সবচেয়ে ভয়ংকর—ব্লিজার্ড বা বরফের ঝড়। এ-দস্যু যখন আসে তেড়ে, সবকিছুকে তোলপাড় করে' দিয়ে যায়। শহরের পথে বাস্ চলা বন্ধ হয়, সমুদ্রে জাহাজ ডোবে। ট্রেন

চলাচলের ঠিকঠিকানা থাকে না,—যে-অসংখ্য মফস্বলবাসী রোজ লণ্ডনে যাতায়াত করে তাদের কারো কারো হয়তো স্টেশনের প্লাটফর্মে রাত কাটে। নদীতে বান ডাকে, খেতে শস্য নষ্ট হয়।

কুয়াশার বিপদও কম নয়। তেমন তেমন গাঢ় হয়ে যখন নামে আর শহরের শ্বাস রোধ করে' আঠার মত লেগে থাকে—এরা তাকে বলে কড়াইশুটির স্যূপ—তখন যান-বাহনের দুর্ঘটনার খবর আসে মুহুর্মুহু। দেখেছি দিনদুপুরে বাসের কণ্ডাক্টার লণ্ঠন হাতে করে' হেঁটে চলেছে আর বাস্ চলেছে পা টিপে টিপে তার পিছনে। নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হয়। লণ্ডনের ফগ্ অবশ্য পৃথিবী-বিখ্যাত, কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টার-এ যেমন দেখেছি এমন আর কোথাও না। পরিষ্কার এক সকালবেলা হঠাৎ চতুর্দিক অন্ধকার করে' নেমে এল কুয়াশা, আকাশ থেকে ঢেলে দে'য়া কোনো তরল পদার্থের মত। কয়েক মিনিটের মধ্যে একহাত দূরের মানুষ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ-শহরে বৃষ্টিও লেগে আছে বারো মাস; দক্ষিণবাসীরা ঠাট্টা করে' বলে ছাতা এবং ম্যাকিণ্টশ্ আবিষ্কার হয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার-এ।

ইংলণ্ড আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা করেছিল এই কুয়াশায় মুখ ঢেকে। সেদিন্ সকাল থেকে জাহাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি বিলেতের সঙ্গে শুভদৃষ্টির অপেক্ষায়। ঝাপসা

আকাশ, টিপ টিপ বৃষ্টি। হঠাৎ অস্পষ্ট দেখা গেল লিভারপুল বন্দরের মূর্তি। দূরে কতগুলি কারখানার চিমনী, সামনে কালিমাখা ঘরবাড়ি। দেখতে দেখতে অকালে সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে—তখন সাড়ে তিনটে কি চারটে। ঘন কুয়াশার আড়ালে শহরের কয়েকটা ঘোলাটে আলো আর ট্রাম-বাসের অস্পষ্ট চলাফেরা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হল, হায়রে, এ-ই কি সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত বহু-প্রতীক্ষিত দেশের চেহারা!···

এছাড়া আছে ঝড় এবং বৃষ্টি। ঝড়ের বেগ মাঝে মাঝে বেশ বাড়ে, নানারকম ক্ষতিও হয়। কিন্তু বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত দুর্বল—অবশ্য বেগে যা পারে না তা একঘেয়েমি দিয়ে পুষিয়ে নেয়। টিপ টিপ টিপ—পড়ছে তো পড়ছেই। তাতে অবশ্য জামা কাপড় ভেজে না, চলাফেরা করতে অসুবিধে হয় না. আমাদের দেশের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে থেকে তারপর জুতো হাতে ছপর ছপর বাড়ি ফিরতে হয় না। বৃষ্টি এখানে ঝমঝমিয়ে আসে কদাচিৎ, তাও মিনিট পনেরো হল তো খুব বেশী। এরকম এক বর্ষণের পর একবার কাগজে দেখা গেল পাড়াগাঁর দিকে কয়েকটি লোক জলে ডুবে মারা গেছে! বাংলাদেশে বর্ষার যে-অতুলনীয় রোমাঞ্চ তা এখানে নেই—সেজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এদেশে বারে বারে। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে

আঁধার করে আসে কিংবা 'গগনে ঘনঘটা শিহরে তরু লতা' এসব দেখা যায় না। আহা, মনে পড়ে একবার এখানে একটি বাঙালী মেয়ের মুখে 'বাদল ধারা হল সারা' গানটি শুনে কী ভালই লেগেছিল! না, এদের বৃষ্টিতে কালো মেঘের আয়োজন নেই, কালবৈশাখীর শিহরণ নেই, নেই 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু'। কাগজে মাঝে মাঝে দেখা যায় thunder-এর খবর, কিন্তু তার ভীরু আলাপ শুনতে হলে কান পেতে থাকতে হয়।

ঠক ঠক ঠক। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হল, দেখা গেল টমাস ওএলিংটন-এর চশমার মোটা মোটা কাঁচ দু'টি। টম্-কে ঐ নামে কেউ ডাকে না—ডিউক অব ওএলিংটন-এর সংক্ষেপ করে' তার নামকরণ হয়েছে শুধু 'ডিউক'। আসলে ছোকরার মধ্যে অ্যারিস্টোক্র্যাসি বা দুর্ধর্ষ সামরিকতা কিছুই নেই। লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে। এ-বাড়িতেই তার বাস, আমার কাছে মাঝে মাঝে আসে আড্ডা দিতে।

'আসতে পারি?'

'তাড়াতাড়ি এসে পড়,' আমি বললাম, 'এবং দোহাই তোমার, দরজাটা বন্ধ কর। ওঃ, কী দেশ বাবা তোমাদের!'

সামনের কৌচটাতে বসে' ডিউক বললে, 'শেষ পর্যন্ত

তুষার পেলাম আমরা! আজ সন্ধ্যাটি awfully nice, কি বল?'

মুখ বেঁকিয়ে বললাম, 'Not awfully nice, just awful!'

আমার কাছে ওদের দেশ সম্বন্ধে এই ধরণের কথা ডিউক অনেকবার শুনেছে। শুনে ও অবাক হয়, বুঝতে পারে না কেন এত খারাপ লাগে দেশটাকে।

একটা সিগরেট বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বললে, 'নাও, এই দিয়ে তোমার দুর্বল ভারতীয় রক্ত গরম করে' নাও। সান্ধ্য কাগজ কিছু আছে নাকি তোমার কাছে?'

এগিয়ে দিলাম ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড। মোটা হরফে প্রকাণ্ড খবর: বরফ আসছে লণ্ডনে। আবহাওয়ার তথ্য এদেশের খবর-কাগজগুলির এক অতি বড় জরুরী উপাদান। আকাশের খেয়ালের মুহুর্মুহু অদল-বদল সকালে বিকেলে সম্পাদকদের অনেক রসদ যোগায়। সংক্ষিপ্ত এক দৈনিক ভবিষ্যদ্বাণী অনেক কাগজেই প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে মাথার কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় ছাপা হয়; যাতে তাড়াহুড়ো করে' প্রাতরাশ খাবার মধ্যেও দিনটা কেমন যাবে সেটা আঁচ করে' নে'য়া চলে। অনেকে তাই দেখে স্থির করেন ছাতা বা ম্যাকিণ্টশ্ নেবেন কিনা, অথবা ম্যাক্ নেবেন না ওভারকোট। যদিও, নেহাত একেবারে ভরা গ্রীষ্ম বা খটখটে রোদ ছাড়া, ছাতা বা ম্যাক্

না-নিয়ে বেরোতে সাহস করে এমন লোক খুব বেশী নেই। থার্মোমিটার যদি এক ঘণ্টার মধ্যে হুড়মুড় করে' কুড়ি-পঁচিশ ডিগ্রি নেমে যায়, আকাশের প্রফুল্ল মুখখানা যদি দেখতে দেখতে ঘোলাটে হয়ে বর্ষণ শুরু হয়, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রকৃতি এখানে অতীব খামখেয়ালী মেয়ে—যার মতিগতি আবহাওয়া-বিশারদ বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত 'ন জানন্তি'। (যদিও, এমন দেশেও তাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই আশ্চর্যভাবে ফলে' যায়।) সুতরাং বর্ষাতিটা হয় গাএ পরে' নয় হাতে বহন করে' বেরোনো এদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। বর্ষাতি দিয়ে অবশ্য তিনটে আপদের থেকে আত্মরক্ষা হয়—শীত, বৃষ্টি এবং ময়লা। ময়লা সহজে আটকায় এখানকার ঠাণ্ডা এবং ভারি বাতাসে; বিশেষ করে' কারখানাও'লা শহরে ধোঁয়া এবং কয়লার গুঁড়োতে জামা-কাপড়ের এমন অবস্থা হয় যে বর্ষাতির বর্ম না হলে চলে না। সে-আবরণটার চেহারা যতই ক্লেদাক্ত হক তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ সেটা পরিচ্ছদ নয়, আচ্ছাদন মাত্র। ড্রয়িংরুমের বাইরে তার স্থান।

শীতের ভয় যেমন এদের বেশী, শীতও তেমনি পেয়ে বসে এদের। সর্দি-কাশি লেগেই আছে বারোমাস। ইনফ্লুয়েঞ্জায় অনেক লোক মারা পড়ে; রোগটাকে বেশ ভয় করে' চলে এরা, কারণ আমাদের মত দু'দিন আপিশ কামাই

করে' বাড়িতে বসে' থাকলেই সেরে ওঠা যায় না। গরম দেশের লোক এখানে এসে এত ভোগে না ঠাণ্ডা লেগে; অথচ উচিত ছিল স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি এদেরই বেশী হওয়া। বাসে ট্রেনে সদাসর্বদা হাঁচি আর কাশি শুনতে হয়। ট্রেনের কামরার দৃশ্য অনেক সময়ে প্রায় হাস্যকর; আট-দশজন লোক মুখোমুখি বসে' আছে খবর-কাগজের আড়ালে নিজের নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দুর্গে; দু'একজন হয়তো চোখ বন্ধ করে' ধ্যান-মগ্ন। অখণ্ড নিঃশব্দতা। হঠাৎ একজন পকেট থেকে রুমাল বা'র করে' সাড়ম্বরে সজোরে অনেক্ষণ ধরে' নাক ঝাড়লেন, কাঁচের শার্শিগুলি ঝনঝন করে' উঠলো যেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। সত্যি, এই প্রক্রিয়াটার বিবিধ শব্দগুলি মোটেই শ্রুতি-সুখকর নয়, এবং অনবধানী দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি চমকে' উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু প্রসারিত 'টাইম্‌স' বা 'ইভনিং নিউজ' কারো এতটুকু নড়লো না, ধ্যানস্থ ব্যক্তির চোখ রইলো নিমীলিত। এই নাক ঝাড়া ব্যাপারটাকে এরা মেনে নিয়েছে নিতান্ত প্রয়োজনের দায়ে। কিন্তু আঘাত লাগে তাদের মনে যাদের দেখে ভাল লেগেছে যে এরা জোরে কথা কয় না বা সশব্দে চা খায় না।

শুধু সে সর্দি-কাশিতে এরা বেশী ভোগে তাই নয়, শীতও যেন এদের অনেককে বেশী কষ্ট দেয় আমাদের চেয়ে। আমরা যখন বেশ আরামে চলাফেরা করি, এরা বলবে

আরেকটু গরম হলে বেশ হত। গ্রীষ্মকালে যে-অল্প-ক'দিন থার্মোমিটার আশি নব্বই ডিগ্রির মধ্যে ওঠা নামা করে তখন এদের খুব আনন্দ—বিশেষ করে' মেয়েদের। তারা ভারি জোব্বা খুলে ফেলে পাতলা সুতির বা রেশমী জামা পড়তে পারে—যৌন আবেদন বিচ্ছুরিত হয় চতুর্দিকে। একবার রোম থেকে প্যারিসে আসার পথে ট্রেনে সঙ্গী ছিল জনৈক ইংরেজ সৈনিক। তখন ওদেশে ১০৫ ডিগ্রি গরম, কিন্তু সৈনিক জানলা খুলতে দেবে না শীতের ভয়ে। গা দিয়ে যখন দরদর করে' ঘাম ঝরে, সে বললো, সেই গরমে তার ঠিক আরাম হয়।

ডিউক হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, 'বরফ আরো আসছে, আমি বলি এই বেলা দেশে পালাও। ওকি, তুমি দেখছি আগুনের দিকে চেয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছ। নিশ্চয় খুব একটা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে ভাবছো।'

একটু ভেবে বললাম, 'তা গুরুগম্ভীর বলা চলে বইকি। আমি ভাবছিলাম তোমাদের এই দেশটার সৃষ্টিছাড়া আব-হাওয়ার কথা এবং তোমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনে তার প্রভাব কতখানি! আমার একটা থিওরি আছে যে আব-হাওয়াই অনেকাংশে দেশে দেশে জাতীয় চরিত্র গঠন করে। ধর, ইংরেজ জাতিকে বলা হয় একাচোরা বা insular,—

আমার মনে হয় শীতের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে insulate করতে করতে মনটাও তোমাদের সেই রকম হয়ে গেছে, ঢেকেঢুকে আড়াল করে' রাখতে চাও তাকে। তোমাদের মুখখানাও অনেক সময়ে এদেশের আকাশের মতই গম্ভীর। ফর্মালিটি-র শৈতল্য বাইরের ঐ বরফকেও হার মানায়। তারপর দেখ, যেহেতু কাজ ছাড়া সংসার চলতে পারে না, সেহেতু ঝড় বৃষ্টি শীত যাই থাক রোজ ভোরে ছ'টার সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়, বেরোতে হয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে—তাতে তোমাদের কষ্টসহিষ্ণুতা বেড়েছে। আর শরীর গরম রাখবার জন্য নড়া-চড়ার প্রয়োজন, সেই কারণে স্বভাবতই তোমরা কাজের লোক। আমাদের দেশে কিন্তু নড়তে গেলেই ঘাম ঝরে, সুতরাং কাজ না-করেই আরাম। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের আদর্শ সরল, কিন্তু তোমরা গান্ধীর পোশাকে সংকুচিত হবে ; অথচ নেংটিই বল আর টাই-ওয়েস্টকোট বল দুই আদর্শেরই প্রেরণা এসেছে জলবায়ুর প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে। শুধু আবহাওয়া নয়, অন্যান্য ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাবও কম নয় জাতীয় চরিত্রের উপর। এই ধর তোমাদের দেশে যদি প্রয়োজনের উপযুক্ত খাদ্য জন্মাতো এবং তোমাদের চতুর্দিকে যদি সমুদ্র না-থাকতো তাহলে পেটের তাড়নায় তোমরা জাহাজে করে' বেরিয়ে পড়তে না, নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দূরদূরান্তরে যেয়ে

লুঠতরাজ করতে না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হয়তো সূত্রপাতই হত না। ইতিহাসের পিছনে ভূগোলের যে কতখানি প্রভাব তা আমরা এখনো ভাল করে' ভেবে দেখিনি। ডিউক, আমার এই থিওরি-টা যদি তুমি ঠিকমত খাড়া করতে পার তাহলে অনেক সহজে ডক্টরেট পাবে।'

ডিউক বললে, 'পকেটে যদি পয়সা থাকে অনেক, বিভিন্ন জাতির চরিত্র এবং ভূগোল অনুশীলনের জন্য নানা দেশ ঘুরে বেড়ানো—মন্দ নয় কথাটা।'

'হ্যাঁ, তখন দেখবে ভারতবর্ষের মত এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি। যেমন মনোরম জলবায়ু, তেমনি সেখানকার লোকদের ধীর স্বভাব।'

ডিউক ক্ষেপে গেল; 'আমাদের দেশটা যদি এতই খারাপ তো এখানে পড়ে' থাকতে বলেছে কে তোমাকে। জান, পৃথিবীসুদ্ধু লোকে মানে আমাদের বসন্তকালের মত সুন্দর ঋতু জগতে আর কোথাও নেই—ভারতবর্ষেও না।'

'আহা, চটো কেন,' আমি বললাম, 'তোমাদের সাম্রাজ্যে সূর্য ডুবতো না, সেজন্য ঘরে উঠত না সূর্য; এবার সাম্রাজ্যে ডুবে' সূর্য উঠবে ঘরে।'

'এটা বেশ সুন্দর বলেছ। এর ভিতরকার অর্থটার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, যদিও দিনকাল ক্রমেই যেমন খারাপের দিকে যাচ্ছে তাতে এদেশের কৃচ্ছ্র-ক্লিষ্ট ঘরে ঘরে

শিগ্‌গির.আর সূর্য উঠবে বলে' ভরসা হয় না।' বলে' ডিউক সান্ধ্য পত্রিকার ক্রসওআর্ড ধাঁধা মেলে ধরলো।

'ভুলে যেয়ো না তোমাদেরই প্রবাদ বাক্য : শীত যদি আসে তো বসন্ত খুব দূরে থাকতে পারে না। দুঃখের দিন শেষ হবে, একদিন সকালে উঠে দেখবে কুয়াশা গেছে কেটে, পরিষ্কার নীল আকাশ থেকে ঝলমলে রোদ ঝরে পড়ছে চারিদিকে।'

বসন্ত প্রতিবার ঠিক এমনি করেই আসে এদেশে। হঠাৎ একদিন সকালে জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সোনালি রোদ চোখে ধাঁধিয়ে দেয়, এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। বেরোলে দেখা যায় পাতা-ঝরা শুকনো গাছপালার একঘেয়ে ম্যাটমেটে-বাদামী রং ভেদ করে' আনাচে কানাচে সবুজের শিষ উঁকি দিচ্ছে। মাত্র ঘণ্টাকয়েকের আপেক্ষিক উত্তাপের সুযোগ নিয়ে নতুন প্রাণ বেরিয়ে এসেছে দিকে দিকে। গতানুগতিক ঘোলাটে দিনের শেষে কাল রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সংগোপনে চলেছে প্রকৃতি-মেয়ের প্রস্তুতি, সূর্য আর সবুজের আয়োজন; সকালবেলা চোখ খুলতেই খিল খিল করে' হেসে উঠেছে। দিকদিগন্তে আকাশে বাতাশে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে সেই হালকা হাসি। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—মৃত্যু আর জড়তার মাঝখানে হঠাৎ-আসা প্রাণের এই মুক্তি আর জয়জয়কার!

মনে হয়, আছি আছি—সৃষ্টির গোড়ার সঙ্গে যোগ রেখে আমিও আছি।

বসন্তের এই নিশ্বাস-কাড়া আকস্মিক আবির্ভাবের কাছে প্রতিবারই নিজের সতর্কতা হার মানে। যতই সংকল্প করি এবার তার আগমনটা দেখবো, সে ছোট মেয়ের মত লঘু পাএ এসে পিছন থেকে চোখ টিপে ধরে। কিন্তু পরাজয়ের লজ্জা ভুলতে কষ্ট হয় না। নতুন পাতা আর ফুলের সম্ভার দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেলে মাঠ ঘাট। আপেলের গাছে সাদা, চেরি-র ডালে ফিকে-বেগ্‌নি ফুল -এত ঘন যে পাতাগুলি সব গেছে ঢেকে—ঝরে' ঝরে' পড়ে' ফুলশয্যা বানাচ্ছে শান-বাঁধানো রাস্তায়। ঢেউ-খেলানো মাঠ ছেয়ে গজিয়ে উঠেছে অগুনতি ডেইজি আর প্রিমরোজ। আহা, এই ছোট ছোট বুনো ডেইজি আমার বড় প্রিয় ফুল; এরা থাকে মাটির কাছাকাছি, ঘাসের উপর নরম সাদা আচ্ছাদন বিছিয়ে দেয়, ফুলদানিতে স্থান নেই এদের, পাএর নিচে নিচেই জীবন কাটে। আর ভাল লাগে লিলি, যেন ঋজুদেহ তন্বী তরুণী, সারা অঙ্গে সৌন্দর্য আর পবিত্রতার সমন্বয়। আরো কত রকম ফুলের ঐশ্বর্য এদিকে ওদিকে! কোথাও কোনো শান্ত নদীর ঢালু পাড় ছেয়ে ফুটেছে সোনালি ড্যাফোডিল; কোথাও বা পার্কের কোণে ফরগেট-মি-নট-এর ঝাড়; কারো বাড়ির বাগানে ম্যাগ্নোলিয়া স্থির হয়ে আছে তপস্যায়—

যেন একটি পাত্র আকাশের দিকে মুখ তুলে কী সুধা সঞ্চয় করছে।···না, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে এদেশের বসন্ত ঋতু আর সব দেশকে হার মানায়। এইতো আর ক'দিন পরেই আসবে সে আবার।

হঠাৎ তার ধাঁধা একপাশে সরিয়ে রেখে ডিউক উঠে গেল জানলার কাছে, পর্দাটা সরিয়েই চীৎকার করে' উঠলো, 'আহা দেখে যাও কী সুন্দর!'

যেয়ে দেখি চাঁদ উঠেছে নির্মেঘ আকাশে, আর তারি আলোয় চতুর্দিক সাদায় সাদা। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। বাড়ীর ছাদে, রাস্তায়, গাছের ডালে, সামনে পার্কের বেঞ্চিতে পুরু হয়ে জমেছে আলগা বরফের প্রলেপ। জ্যোৎস্না চকচক করছে এখানে ওখানে। চোখ ধাঁধায় না এই সাদা—এর স্পর্শ যেমন কোমল, রংটাতেও সেরকম এক মৃদু মাধুর্য। দু'একটি পথিকের পদচিহ্ন গভীর দাগ কেটে চলে' গেছে রাস্তার উপর সরল রেখায়। এই তুলতুলে নরম, কুমারী-শুভ্র নিষ্কলঙ্ক তুষার দলিত করে' হাঁটতে বেশ আরাম, কিন্তু কাল যখন লোকের পাএর চাপে চাপে কাঁচের মত কঠিন আর পিছল হয়ে যাবে তখন এই পথে চলতেই মনে জাগবে ভয়। তারও পরে যখন একটু গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের

কাদা জুতোর আনাচে কানাচে ঢুকে পড়বে তখন লাগবে বিরক্তি।

কিন্তু আপাতত, জ্যোৎস্না-ছাওয়া বরফ-ঢাকা এই স্থির জগত অতি মনোরম।

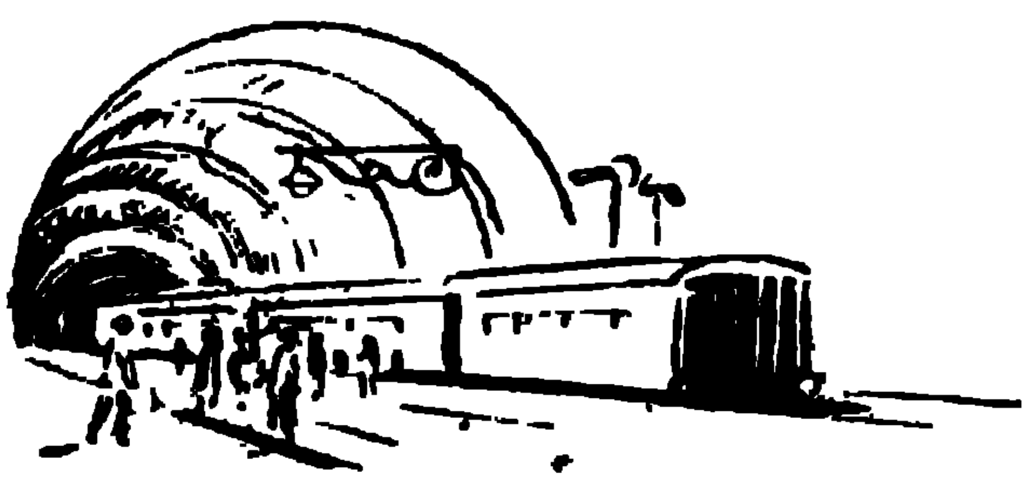

মহানগরের মেলা

নেপোলিয়ন না কে যেন বলেছিল, ইংরেজ হচ্ছে দোকানদারের জাত। জাতীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজতে চেষ্টা করলে এদের মধ্যে দোকানদারি ছাড়া অন্যান্য বিশেষত্বও পাওয়া যেতে পারে। যথা, ইংরেজকে বলা চলে ছাতা বা ব্যাগ বাহকের জাত, কিংবা কাগজ পড়ুয়ার জাত। কিন্তু সব বৈশিষ্ট্যের বাড়া বোধহয় এদের 'পাব্'-প্রীতি।

পাব্ শব্দ 'পাবলিক বার'-এর অপভ্রংশ। শহরের পাড়ায় পাড়ায়, দূরাতিদূর পল্লীগ্রামের আনাচে কানাচে আছে এই 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান'। রেলগাড়ি, বিদ্যুত, গ্যাস, টেলিফোন না-হলে চলে, কিন্তু পাব্ ছাড়া সমাজ অচল। দিনের শেষে যত রাজ্যের খবরাখবরের আদান প্রদান, আলোচনা ও খোশগল্পের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র পাব্। পুরুষেরই প্রাধান্য এখানে।

অনেকটা ক্লাবের মত ব্যাপার—খেলার ব্যবস্থা আছে, হালকা আহারও পাওয়া যায়। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে সর্বদা হাতের কাছে থাকে এক গ্লাস পানীয়।

পাব-এর আকর্ষণের মধ্যে পানটা যে প্রধান নয় যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ অধিকাংশ লোকেই পান করে বীয়ার—তিক্ত অথবা মৃদু—এবং এখনকার বীয়ার-এ আছে অ্যালকহল-এর ক্ষীণতম লেশমাত্র। ওটাকে ছুতো করে' আসলে এরা আসে প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করতে, অথবা ঘর-সংসারের ঝামেলার বাইরে নিরিবিলি একাকিত্বের লোভে, কিংবা শুধু সময় কাটাতে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবার পথে বৃষ্টি এড়াবার অজুহাতে ঢুকে পড়েছিলাম পাড়ার এক অভিজাত পাব-এ। ঝুলন্ত এক কাঠের ফলকে লেখা দোকানের নাম 'দি ব্লু ড্র্যাগন', আর তার নিচে আঁকা ঐ কাল্পনিক জানোয়ারটার ছবি। এ-জায়গাটার আভিজাত্য বার্ধক্যের দৌলতে,—পুরনো মদের যেমন দাম বেশী, এসব প্রতিষ্ঠানেরও তাই। ঘরের মধ্যেও সবকিছুতে পৌরাণিক ছাপ সযত্নে বজায় রাখা হয়েছে।

দুই দেয়ালে মুখোমুখি জ্বলছে গনগনে কয়লার আগুন। ঘর গমগম করছে ভীড়ে, তামাকের ধোঁয়ায় বাতাস ভারাক্রান্ত। গ্লাসটি হাতে করে' খুঁজতে খুঁজতে সৌভাগ্যবশত কোণের দিকে একটা খালি চেয়ার পেয়ে গেলাম। পাশে জানলার

নক্সা-কাটা কাঁচে জলের শব্দে টের পাওয়া গেল বৃষ্টিটা বেশ চেপে এসেছে।

সামনে স্যাণ্ডুইচ আর বীয়ার নিয়ে বসে' ছিল এক বুড়ো। কিছুক্ষণ আড় চোখে আমাকে যাচাই করে' নিয়ে কথা পাড়লে। প্রথম আলাপ অবশ্য যা না-হয়ে উপায় ছিল না তাই—অর্থাৎ, 'বিশ্রী দিন, কি বল?'

অভ্যস্ত সমবেদনার স্বরে বললাম, 'যা বলেছ।'

বুড়ো খুশী হয়ে বললে, 'তোমাদের খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েছিলে? আমার মনে হয় তোমরা আগের চেয়ে অনেক উন্নতি করেছ। অমরনাথ একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় সন্দেহ নেই।'

বুড়ো যে পুরোদস্তুর London-cockney তা তার কথার স্বরে বোঝা গেল। আমাদের ঢাকা শহরের কোচোযানদের যেমন আছে নিজস্ব ভাষা, তেমনি এদেরও। এরা শত চেষ্টাতেও 'পেপার' বা 'রেইন' বলতে পারবে না, বলবে পাইপার এবং রাইন।

'ভারতবর্ষে কোথায় তোমার বাড়ি?'

'বাংলাদেশে।'

'ও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশে। এদেশটা কেমন লাগছে?'

'মন্দ কী! অবশ্য এখন পড়েছে কষ্টের দিন। তোমার দেশ কোথায়?'

'Good old London। বরাবর আমার এ-শহরেই বাস। এখন কেমন মায়া পড়ে' গেছে। লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইনে।' বলে' বুড়ো চোখ টিপে হাসলো।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর লণ্ডন। লোকসংখ্যা সমগ্র অস্ট্রেলিয়া-র চেয়ে বেশী। এত বড় যে যারা এই বুড়োর মত এখানে জীবন কাটিয়েছে তাদেরও অনেকে জানে না এ-শহরের অনেক পাড়া। গোটা দশেক প্রধান রেল-স্টেশন, তিনশো বাস্-পথ; পাঁচটি সুরঙ্গ-রেলপথ মাটি ভেদ করে' চলে' গেছে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে মাইলের পর মাইল,—দক্ষিণে টেম্‌স নদীর তলা দিয়ে।

লণ্ডনকে যখন দেখেছি ছবিতে—বইএর পাতায় ও সিনেমার পর্দায়—তখন সে ছিল মায়ায় ঘেরা, অনেক সুন্দর। তারপর প্রথম যখন চর্মচক্ষে সাক্ষাৎ হল—কী গভীর ব্যর্থতা, কী মর্মন্তুদ শূন্যতা! মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের সন্ধ্যা; ছুটতে ছুটতে দেখতে গেছি পিকাডিলি সার্কাস—পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের 'হৃদ্‌পিণ্ড'। চোখে দেখে কিছুতে বিশ্বাস হতে চায় না এই সেই জায়গা। পাঁচ-ছ'টা নাতিপ্রশস্ত রাস্তা একসঙ্গে এসে মিশেছে সংকীর্ণ একটুখানি বৃত্তাকার ভূখণ্ডে। এই নাকি এদের ফ্যাশানের তীর্থক্ষেত্র, আভিজাত্যের সপ্তম স্বর্গ!

এরা বলে যুদ্ধের দুর্দিনে লণ্ডনের সব ঔজ্জ্বল্য ঢাকা পড়েছে, এ-চেহারা দেখে তাকে বিচার করো না। নেই হোটেল সিনেমা থিয়েটারের সামনে চোখ-ঝলসানো আলো, নেই :আকাশের গাএ নিওন-প্রদীপের রামধনু। সবই সত্যি, কিন্তু পিকাডিলি সার্কাসের পরিধি তখন এর চেয়ে বড় ছিল না, শাফ্‌টসবেরি অ্যাভিনিউ ছিল না আরো প্রশস্ত। প্যারিসের প্লেস ডে লা কন্‌কর্ড ছেড়ে দাও, অনেক সাধারণ বড় রাস্তার মোড়ও যে সে-শহরে এর চেয়ে জমকালো।

দু'ঢোক বীয়ার গিলে হাতের পিঠে মুখ মুছে বুড়ো বললে আপন মনে, 'অনেকে বলে লণ্ডন কুৎসিত, কিন্তু আমি জীবন কাটিয়েছি এখানে, আমি লণ্ডনের অংশ হয়ে গেছি, এড়াতে পারি নে।'

তা ঠিক, লণ্ডন শহরের পোশাকটা সুন্দর নয়—সুপ্রসিদ্ধ ওএস্ট এণ্ড পল্লীরও। এখানে অবশ্য আছে অতিকায় অট্টালিকার শ্রেণী, কিন্তু তাদের গাএর রং কালো। এদেশের সব বড় শহরেরই এই দোষ। কল-কারখানার যত কালিঝুলি তা ভারি বাতাস ভেদ করে' বেরিয়ে যেতে পারে না, চেপে বসে শহরের গাএ। কিন্তু, বাইরের সৌন্দর্যের দাম থাকলেও সেটাই সব নয়। কাছাকাছি কিছুদিন বাস করলে ভাল লেগে যায় লণ্ডনের অন্তরকে। তখন লীড্‌স বা ব্রিস্টল-এ বেড়াতে গেলে বোঝা যায় লণ্ডন কত সুন্দর।

মহানগরের মেলা

ভাল লাগে এই জনসমুদ্রে এক বিন্দু অংশ হয়ে ভেসে বেড়াতে, চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাটির গহ্বরে নামতে, তারপর অন্ধকার ভেদ করে' দৈত্যের মত যে-গাড়িটা এসে দাঁড়ায় মুহূর্তের জন্য, তার মধ্যে ভীড় ঠেলে উঠে আর দশ-জনের সঙ্গে দাঁড়াতে। পাতালের ট্রেন চলে সংকীর্ণ সুরঙ্গের মধ্য দিয়ে বিপুল গতিতে; বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, মধ্যে একটা আলোর রেখাকে আশ্রয় করে' পতঙ্গের মত কতগুলি মানুষ। লণ্ডনের লোক,—এক পথের যাত্রী!

ভাল লাগে বসন্ত সমাগমে কিউ-উদ্যানের ফুল-সম্ভারের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে, গ্রীষ্মের অপরাহ্নে রিজেণ্ট পার্কের চিড়িয়াখানায় খাঁচার থেকে খাঁচায়, তারপর হেমন্তে হাইড পার্কের পাতা-ঝরা গাছের নিচে। শীত যখন আসে, বাইরে ঘুরে বেড়ানো তখন সুখকর নয়। প্রকৃতিকে তখন রাখতে ভাল লাগে জানলার ওপারে। লণ্ডনের ঐশ্বর্য তখন মিউজিয়াম, প্রদর্শনী, থিয়েটাব, লাইব্রেরি, ব্যালে, অপেরা।

মিউজিয়ামের সংখ্যা অনেক। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাসেল স্কোয়ার-এ ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং তার সংলগ্ন পুস্তকালয়। এর প্রাণীতত্ত্ব অংশটা অনেক দূরে দক্ষিণ কেন্‌সিংটন-এ। এ-বাড়িটার ভিতরে ঘর থেকে ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ানো অতি আনন্দজনক অভিজ্ঞতা। কতবার গেছি, তবু রোমাঞ্চ কমে নি কারণ প্রতিবারই নতুন জিনিস আবিষ্কার

করতে .কষ্ট হয় না। তারপর ও-পাড়াতেই আছে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আরো একাধিক যাতুঘর—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, ইত্যাদি। কাছেই ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটুট্যট-এ সাজানো আছে নানা দেশের পণ্যদ্রব্যের মেলা, কোন্ জিনিস কী করে' তৈরি বা উৎপন্ন হয় তার চাক্ষুষ প্রদর্শন। ভূগোলের পাতার থেকে যা শিখতে যেয়ে চোখ ঢুলে আসতো ঘুমে, এখানে তা-ই শেখা হয়ে যায় অক্লেশে, প্রায় অগোচরে। ইতিহাসের জন্য আছে ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম —কত যুগের কত দেশের পোশাক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, ছবি, ইত্যাদি আরো কত কিছুর নমুনা। এই সব বাড়িগুলি সারা বছর খোলা থাকে সাধারণের জন্য এবং ঢুকতে দিতে হয় না কিছু দক্ষিণা। প্রত্যহ থাকে বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা—কখনো ঘরে বসে', কখনো বক্তব্য বিষয়ের নমুনার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে। এদের যাতুঘরে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভীড় লক্ষণীয়। এরা হয় আসে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দল বেঁধে, নয়তো ছুটির দিনে বাবা-মা'র সঙ্গে। শহরের বাইরের থেকে অনেকে চলে' আসে সকালবেলা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে, দুপুরে কোথাও বসে' পকেট থেকে স্যাণ্ডুইচ বা'র করে' খায়, বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে যায়। আমরা ছোটবেলায় বইএ পড়ি হাওয়া-জাহাজ বা বাষ্পযান আবিষ্কারের ইতিহাস, দু'দিন পরে

যাই ভুলে'; এদের ছেলেরা মডেল দেখে' শেখে—অনেকক্ষেত্রে সত্যিকারের আদি জিনিসটাই দেখতে পায়,—মনে রাখে সহজে।

এ ছাড়া নানারকমের বিশেষ প্রদর্শনী সারা বছর লেগেই আছে। হয়ত অ্যাটমিক এনার্জি বা ঐ ধরণের কোনো আধুনিক-বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নিয়ে,—অথবা এদেশের বিচিত্র পণ্যসম্ভারের হাট, যথা, ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিজ ফেয়ার বা ব্রিটেন-ক্যান-মেক-ইট একজিবিশন। কাতারে কাতারে লোক ছোটে এসব মেলায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শীত বৃষ্টি তুচ্ছ করে' দাঁড়ায় টিকিটের জন্য।

এদেশের এসব যাদুঘর বা প্রদর্শনীর থেকে শিখবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে বোধহয় সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় কী করে' লোককে শেখাতে হয় তার কৌশলটি। এরা এমন ভাবে নমুনাগুলি সাজায়, এমন সুন্দর লেখে পরিচয়-লিপি যে সহজেই দর্শকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, জানার তৃষ্ণা জাগে মনে।

আর্ট গ্যালারি অর্থাৎ স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনী আছে একাধিক। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি এবং রয়াল অ্যাকাডেমি-র প্রদর্শনী। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও আছে বহু স্কেচ এবং ড্রয়িং। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি-তে বহু সুপ্রসিদ্ধ ক্লাসিকাল ছবির স্থান—বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন

দেশের, বিভিন্ন ধারার। বহু অর্থব্যয়ে, বহু চেষ্টায় একত্রিত হয়েছে এই সংগ্রহ,—কোনো কোনো ছবির দাম এখন দশ লক্ষ টাকারও বেশী। এখানে ঘরে ঘরে অফুরন্ত বিস্ময় আর আনন্দের খোরাক; দেখতে দেখতে পা ব্যথা হয়ে যায়, আশ মেটে না। শুধু চিত্রকলার মধ্যেই কত রকমের বৈচিত্র্য আছে তাই দেখে চমৎকৃত হতে হয়। যথা, পোর্টরেট-এ প্রাণ যে কতখানি মূর্ত হতে পারে তা জানা ছিল না যত দিন না-দেখেছি ডাচ্ শিল্পী Rembrandt-এর Saskia as Flora, অথবা Margaretha Trip। নারীদেহের চরম নিখুঁত সুসামঞ্জস্য এবং ত্বকের অতি আশ্চর্য বর্ণলালিত্য ফুটেছে স্পেনীয় শিল্পী Velasquez-এর Venus and Cupid ছবিতে। ল্যাণ্ড্‌সকেইপ শ্রেণীতে Constable-এর Vale of Dedham বা Rubens-এর The Watering Place-এ আছে অমর লিরিক কবিতার সুর। জার্মান শিল্পী Duerer-এর Virgin with the Iris চিত্রের বলিষ্ঠ রেখায় আর দৃঢ় বর্ণবিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে এক আশ্চর্য স্পষ্টতা। ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির নিখুঁত কারুকাজে মুগ্ধ হতে হয় Jan Gossaert-এর Adoration of the Magi দেখে। Titian-এর Vendramin Family-র ছবিতে ফুটেছে মানুষের মুখে এমন ঐশ্বরিক পবিত্রতার ছাপ যা অতি বড় প্রতিভা ছাড়া কেউ কল্পনা করতে পারে না। বহুশতাধিক

বছরের পুরনো এসব ছবি কালের প্রভাবে ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। সুখের বিষয় সম্প্রতি ন্যাশনাল গ্যালারি ল্যাবরে-টরি-তে উদ্ভাবিত হয়েছে ছবির আবিলতা দূর করার এক পদ্ধতি; আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যে ফুটে উঠেছে আবার বহু পুরাতন চিত্র।

বার্লিংটন হাউস-এ রয়াল অ্যাকাডেমি বহুবিধ অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিভিন্ন দেশের শিল্পের সঙ্গে এদেশের জনসাধারণের পরিচয় করানো তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। যুদ্ধের পর এই শ্রেণীতে প্রথম অনুষ্ঠিত হল ১৯৪৭-এর শেষে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। মহেঞ্জোদারো-র ভাস্কর্য থেকে আরম্ভ করে' আজকের যামিনী রায়ের ছবি পর্যন্ত স্থান পেয়েছিল এতে।

এদের জনসাধারণের পক্ষে যামিনী রায়ের আর্ট উপভোগ করা সহজ নয়, কিন্তু এরা সবরকমে অভ্যস্ত। এই কিছুকাল আগে পিকাসো এবং মাটিস-এর প্রদর্শনীতে আধুনিক ফরাসী ধারাকে এরা বরদাস্ত করেছে। প্যারিস অনেক কাছে কলকাতার থেকে, কিন্তু পিকাসো-র চেয়ে যামিনী রায় সহজবোধ্য। সন্ত্রাসবাদী সনাতনীরা একটা রব তুলেছিল প্রদর্শনী বন্ধ করে' দেবার জন্য,—কিন্তু এদেশের গণতন্ত্রের গুণে সেটা হয়নি। দলে দলে লোক গেছে এই সময়ে সবচেয়ে বড় জীবিত শিল্পীর ছবির সঙ্গে সাক্ষাত আলাপ

করতে। আলাপ হয়েছে, পরিচয় হয়নি অধিকাংশেরই। কেউ হেসেছে, কেউ ক্ষেপেছে। কম্যুনিস্ট্ পিকাসো চ্যানেল-এর ওপার থেকে বললেন, মনন-ক্ষমতা এবং সৌন্দর্য-বোধ সব মানুষের সমান নয়। সাম্যবাদ এখানে খাটে না।

তার ছবির বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ দুর্বোধ্যতার, দ্বিতীয় বীভৎসতার। দুর্বোধ্যতার সূত্রে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। সে-ছবিতে ইঙ্গিত প্রধান, তারই সাহায্যে চরিত্র উঠেছে ফুটে—বর্ণনার সমাপ্তিতে নয়। এই 'অসমাপ্তি'ই, আমার মনে হয়, পিকাসো-কেও করেছে দুরূহ। দৃষ্টান্ত : Woman in the Rocking Chair কিংবা Paris ; শেষোক্ত চিত্রে শুধু ত্রিকোণ এবং চতুষ্কোণ নক্সার ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে সেতু, রাস্তা, বাড়ির ছাদ। আর, বীভৎসতা যা আছে সেটা অবশ্য টেকনিক বা আঙ্গিকের কথা। মানুষ স্বপ্ন দেখতে চায় সুন্দরের, কিন্তু চতুর্দিকে যখন অসত্য আর অকল্যাণ ঘনিয়ে আসে তখন কি দুঃস্বপ্নকে এড়াতে পারি ? পিকাসো-র মূর্তিগুলি এইসব ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের থেকে বেরিয়ে এসেছে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের ভিত্তিতে আঁকা প্রসিদ্ধ Guernica চিত্রের দলিত মথিত বিকল অঙ্গগুলি দেখে অন্তত তা-ই মনে হয়। অ্যানাটমি-র বিচারে পিকাসো-র মূর্তিরা, যাকে বলে, monsters ; তারা মানুষ না কোনো আধা-কাল্পনিক জানোয়ার, এবং তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কোথায়,

অনেক সময়ে তা-ই বোঝা যায় না। প্রোফাইল মুখে দু'টো চোখ অথবা মাথার থেকে নির্গত একটা পা দেখলে হঠাৎ কেমন ধিক্কার আসে সন্দেহ নেই,—কিন্তু ঠিক তা-ই হয়তো ছবির উদ্দেশ্য। অ্যানাটমি-র অসম্ভব বিকৃতি মনের সম্ভব বিকৃতির রূপক মাত্র। পিকাসো-র ছবি সৌন্দর্যপিপাসুর গান নয়, সৌন্দর্যপিপাসুর কান্না।…ম্যাটিস-কে মনে হল অপেক্ষা-কৃত সহজবোধ্য। পিকাসো-র কটু তিক্ততা তার ছবিতে দেখা গেল না। বড়জোর একটু অস্পষ্ট। রেখার সুডৌল বক্রতা যামিনী রায়ের ধারাকে মনে পড়ায়।

ঘুমে কিংবা বীয়ার-এর কাল্পনিক নেশায় বুড়ো ঝিমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চোখ খুলে বললে, 'বৃষ্টি কমেছে ?'

বললাম, 'তা এখন বেরোনো চলতে পারে।'

কিন্তু উঠবার উৎসাহ সে দেখালে না, ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, 'আমার নাতি দু'টো এখনো ঘুমোয় নি, বাড়ি গেলেই তো ওদের জ্বালাতন সইতে হবে।'

বললাম, 'তবে বস, আরো দু'টো গ্লাস নিয়ে আসি।'

ফিরে আসার পর ধন্যবাদ জানিয়ে সিগরেট এগিয়ে দিলে, তারপর বললে, 'আমার এই বুড়ো বয়সের একমাত্র বিলাস সিগরেট। দাম এত বেড়ে যাচ্ছে, ওটাকে ছেড়ে দে'য়া উচিত—কিন্তু ছাড়লে আমার জীবনে আনন্দ আর

কিছুই থাকবে না। তোমাদের মত বয়সে থিয়েটারে যেতাম খুব ; এখন আর শরীরে দেয় না।'

প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম ইত্যাদি ছাড়া লণ্ডনের আর একটি বড় আকর্ষণ রঙ্গমঞ্চ। এরা শুধু সংখ্যাতেই নয়, চরিত্রেও অনেক। দর্শকের স্বাভাবিক ধাত বা সাময়িক মেজাজ যাই হক না কেন, কোথাও না কোথাও তার উপযুক্ত খোরাক পাওয়া যাবে। লঘু অনুষ্ঠান যা আছে তার মধ্যে অতীব উপভোগ্য এদের revue বা variety show। ছোট ছোট কয়েক মিনিটের দৃশ্য—নাচ, গান, ক্যারিকেচার, রসালাপ, ম্যাজিক, জিম্‌নাস্টিক, কমিক, ক্ষুদ্রাঙ্ক নাটিকা, ইত্যাদি মিলিয়ে বৈচিত্র্যের মেলা। সাময়িক কোনো ধারা বা খবর উপলক্ষ করে' কোনো কোনো দৃশ্যের বিষয়বস্তু তৈরি হয় বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। আমাদের দেশে এ-জিনিসটার এক দরিদ্র সংস্করণ স্কুল-কলেজে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখনো নয়। অথচ, মনে হয়, সুবিবেচনার সঙ্গে যদি নিত্য নতুন প্রোগ্রাম বানানো যায় তবে এ-ধরণের এক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গতানুগতিক নাট্যমঞ্চের চেয়ে অনেক বেশী লাভজনক হতে পারে।

এদের Windmill থিয়েটারের নাম বিলেত-ফেরতদের কল্যাণে আমাদের দেশে অনেকেই জানেন। যারা নতুন এসেছেন এদেশে তারা আড়ালে ফিসফিস করে' জিজ্ঞাসা

MAHARAJA BIR BIKRAM COLL...
7028
L 3.2.61

করেন, ও-বাড়িটা কোথায়। এই পর্দাটুকুর প্রয়োজন কিন্তু এখানে নেই, গলা খুলেই এ-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ এরা কেউ ওখানে গা ঢাকা দিয়ে যায় না—এদের যাওয়ার মধ্যে সত্যিই কোনো কুণ্ঠা নেই। নবাগত আনন্দ-লিপ্সু যদি পিকাডিলি-র মোড়ে পুলিসম্যান-এর অভিমত চায়, তবে সে সম্ভবত এই বাড়িটাই দেখিয়ে দেবে। উইণ্ড্‌মিল থিয়েটার—এবং যুদ্ধের শেষে কিছুদিনের জন্য Phyllis Dixit—এদের কাছে একটু কড়া ঝাঁজালো অবসর-বিনোদন ছাড়া কিছু নয়। কাজের একঘেয়েমিতে ঝিমিয়ে-পড়া দেহ এবং বিরক্ত মনকে কিছুটা চাঙা করে' তোলার রসদ। সিনেমা থিয়েটার অপেরা যখন পান্‌সে বীয়ার তখন এ-জিনিসটা কয়েক ঢোঁক ক্রিম-দে-মিন্‌থ। যদিও, খাঁটি 'ফরাসী মদ' Folies Bergere এমন কি প্যারিসের মর্মা পল্লীর যে-কোনো নাইট-ক্লাবের তুলনায় উইণ্ড্‌মিল নিতান্তই অসার,—একপাত্র জলে বিন্দুকয়েক শ্যাম্পেন।

এও variety show, তবে সবকিছুতে যৌন আবেদনের প্রাধান্য। এদেশে পুরোপুরি অনবগুন্ঠিতা এবং অকুন্ঠিতা হওয়া নিষিদ্ধ—যেসব উর্বশীরা মেখলা-টুটিতা অসম্বৃতা তারা থাকেন পাতলা পর্দার আড়ালে, আধো-অন্ধকারে। এই দেখে চিত্ত আত্মহারা হবার কারণ নেই। কিন্তু আমাদের ভারতীয়দের কাছে এ-ই নিষিদ্ধ ফল; তাই আমরা লুকিয়ে

আসি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে' থেকে একই চক্রগামী প্রোগ্রাম বারে বারে দেখি। বাইরে এসে এদের দুর্নীতির নিন্দা করি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে: তবে তুমি গেলে কেন এই বেহায়াপনা দেখতে, বলি: এদের দুর্নীতির মাপ নেবার জন্য। একাধিকবার একই প্রোগ্রাম না-দেখলে ভাল করে' বোধহয় মাপও নে'য়া যায় না। কেউ কেউ আবার আছেন অকুণ্ঠিত সমঝদার। দেশে ফেরার পর এদের উচ্ছ্বাস-গদগদ বর্ণনায়—এদের কাছে কয়েকবিন্দু শ্যাম্পেনই যথেষ্ট—হতভাগ্য নেটিভ ম্লেচ্ছরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

লঘু অনুষ্ঠানের মধ্যে এছাড়া আছে মিউজিকাল কমেডি। এতে গান বাজনা হাসি নাচই আসল, গল্প নগণ্য। এই শ্রেণীর রচনায় এবং প্রযোজনায় ইংরেজরা বিশেষরূপে দক্ষ বলে' মনে হয় না, যদিও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে চোখে পড়ে; যথা, Adelphi থিয়েটারে অভিনীত Bless the Bride, যার সুন্দর সংলাপ লিখেছিলেন পার্লামেণ্ট-সদস্য সুরসিক এ. পি. হার্বার্ট। এক্ষেত্রে আমেরিকানরা এদেশে দিগ্বিজয় করেছে। Annie Get Your Gun এবং Oklahoma চলেছে মাসের পর মাস, তবু ভীড় বেড়েই চলেছে, তিন মাস আগের থেকে বিক্রি হয়ে গেছে সব টিকিট। গানগুলি সর্বত্র লোকের মুখে মুখে, তবু যেন পুরনো হয় না। খুব নাম-করা অভিনেতৃ-সম্মেলন নেই,—আসল

গুণ সংলাপের এবং গানের কথার ও সুরের। অর্থাৎ জয়মাল্য আর্ভিং বার্লিন প্রমুখ আধুনিক সংগীতরচয়িতা ও সুরকারদের।

আধুনিক সামাজিক নাটকও অতলান্তিকের ওপার থেকে প্রায়ই আসে। বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় Garson Kanin রচিত Born Yesterday, John van Druten-এর Voice of the Turtle এবং I Remember Mama, Arthur Miller রচিত All My Sons, ইত্যাদি। আধুনিক ইংরেজ নাট্যকারদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বোধহয় জে. বি. প্রিস্ট্লি, তারপর নোএল কোআর্ড, এমিলিন উইলিয়াম্স এবং কনিষ্ঠ দলে টেরেন্স র‍্যাটিগান। প্রিস্ট্লি-র Ever Since Paradise যারা দেখেছে তারা মুগ্ধ হয়েছে repartee-র চাকচিক্যে এবং দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্য দেখানো আঙ্গিকের নতুনত্বে। যদিও এ-বিষয়েও আমেরিকানরা বোধহয় আরো অগ্রগামী; দৃষ্টান্ত, উপরোক্ত I Remember Mama। এদের অনেক নাট্য-গৃহে ঘুর্ণী-মঞ্চ নেই কলকাতার মত, তবু রচনা এবং প্রযোজনার নতুনত্বে এবং উদ্ভাবনী গুণে এদের অনুষ্ঠান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী আধুনিক, চমৎকার এবং উপভোগ্য হয়ে থাকে।

আধুনিক নাটকের মধ্যে বিশেষ করে' একটির উল্লেখ করতে চাই, কারণ এর মধ্যে পাওয়া যায় এদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিকের নির্দেশ। নোএল কোআর্ড-এর নাটক

Peace in Our Time বিগত যুদ্ধের একটি সম্ভাবনার ভিত্তিতে লেখা। জার্মানি এসে এদেশ দখল করলো, এবং তারপর এদের গুপ্ত আন্দোলন কী করে' শত্রুর সঙ্গে লড়ে' চললো তাই নিয়ে গল্প। দেশপ্রেমিকতা বহুকাল মানুষের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, এবং সেই কারণে নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বিষয়বস্তু বলে' গণ্য হয়েছে। কিন্তু দেশপ্রেমিকতার বাড়াবাড়ি যে অনেক সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্তর্নিহিত কারণ সেটা সাধারণ লোকেও আজকাল বুঝতে আরম্ভ করছে। যুদ্ধের মধ্যে এ-ধরণের নাটকের প্রয়োজন থাকতে পারে প্রোপাগাণ্ডা-র খাতিরে,—১৯৪৭ সালে এর জনপ্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু এই নাটকের দেশপ্রেমিকতা একটু বিশেষ ধরণের—জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ সেটাই। এর অন্তর্নিহিত সুর: আমাদের মত এমন সর্বাঙ্গসুন্দর জাত জগতে আর নেই। ইংরেজ জাতির আত্ম-প্রসাদ বা smugness এককালে ছিল জগত-বিখ্যাত, কিন্তু গত যুদ্ধের মধ্যে এবং পরে এ-মনোবৃত্তির গাএ লেগেছে অনেক রূঢ় অপমানের আঘাত। সেই আহত অহংকারের গাএ হাত বুলিয়ে এই ধরণের নাটক এবং সাহিত্য আজো 'সাফল্য' অর্জন করে। কিন্তু বিদেশীদের চোখে (এবং এদের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চোখে) এটা সস্তা এবং শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসবৃত্তি ছাড়া কিছু মনে হবে না।

আধুনিক সামাজিক নাটক ছাড়াও পুরনো কিন্তু চিরনতুন প্রসিদ্ধ নাটক সর্বদাই লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে পাওয়া যায়। যুদ্ধের পরে এদিকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান Laurence Olivier-এর,—Old Vic Co.-র প্রযোজনায়। সেইণ্ট মার্টিন্‌স লেন-এর প্রসিদ্ধ নিউ থিয়েটার-এ অলিভিয়ে এবং রাল্‌ফ রিচার্ডসন মাসের পর মাস শেক্‌সপীয়রকে পরিবেশন করেছেন অতি সুন্দরভাবে, সঙ্গে ছিলেন সিবিল থর্নডাইক। হেনরি দি ফোর্থ নাটকে রিচার্ডসন-এর ফল্‌স্টাফ ভুলবার নয়। এই নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে অলিভিয়ে দেখা দিলেন জাস্টিস শ্যালো-র ক্ষুদ্র অংশে। মঞ্চে এবং পর্দার গাএ তাকে আমরা চিরদিন দেখেছি তরুণ নায়করূপে, কিন্তু এখানে এই বৃদ্ধের ভূমিকাতেও দেখলাম নিখুঁত অভিনয়। মনে প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশের উজ্জ্বল তারকারা এত ছোট এবং নগণ্য অংশ গ্রহণ করতেন কী!

সম্প্রতি হ্যামলেট নাটক চলচ্চিত্রে তুলবার কাজে ব্যস্ত থাকায় তাকে মঞ্চ থেকে সাময়িকভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল। সন্দেহ নেই, জীবিতদের মধ্যে আজ তিনি সবচেয়ে বড় শেক্‌সপীরীয় অভিনেতা। ওল্ড ভিক কোং-র কাজের জন্য তিনি এবং রিচার্ডসন দু'জনেই 'সার' উপাধি পেলেন। এই সম্মান পেতে তার এক বছর দেরি হল কারণ তিনি এবং পত্নী ভিভিয়েন লী দু'জনেই ডিভোর্স করেছিলেন প্রথম

স্ত্রী এবং স্বামীকে। পারিবারিক সম্ভ্রমের যে কত দাম এদেশে তা আমরা দেখেছি অষ্টম এডোআর্ড-এর সিংহাসন ত্যাগে। কিন্তু এক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত সংস্কার পরাজিত হল, খেতাব পেলেন অলিভিয়ে।

শেক্‌সপীরীয় নাটকে Donald Wolfit এবং তার দলের নামও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অলিভিয়ে-র সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী John Gielgud। কারো কারো মতে অলিভিয়ে-র চেয়ে ইনি ছোট নন। Crime and Punishment উপন্যাসের নাট্যরূপে নিউ থিয়েটার মঞ্চে একে যারা দেখেছে রাডিয়ন-এর ভূমিকায় তাদের সন্দেহ থাকতে পারে না ইতি অতি উঁচু দরের অভিনেতা। ডস্টয়েভ্‌স্কি-র এই অতি নাটকীয় গল্পের ঘটনা পরম্পরার ঔজ্জ্বল্যও তার অভিনয়কে স্তিমিত করতে পারে নি।

শেক্‌সপীয়র ছাড়া মহারথীদের মধ্যে বার্নার্ড শ-কে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে ঘন ঘন পাওয়া যায়। অস্কার ওআইলণ্ড-এর আকর্ষণ আজো বেড়ে চলেছে। আর্ট্‌স থিয়েটার মঞ্চে ইবসেন-র The Master Builder মনে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। আসলে আর্ট্‌স থিয়েটার একটি ড্রামাটিক ক্লাব,—এখানে অভিনয় শেখার ব্যবস্থা আছে। সভ্যরা ছাড়া কেউ টিকিট কিনতে পারে না। এদের বিশেষত্ব, এরা গতানুগতিক ছেড়ে দিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা

করেন। অত্যন্ত মনোরম আরামদায়ক প্রেক্ষাঘর—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং পয়সা বেশী আসে না। এরাঁ যে-রস পরিবেশন করেন তা সাধারণের জন্য নয়। শ-র বিরাট Back to Methuselah এরা দেখিয়েছিলেন তিন কিস্তিতে।

এই প্রসঙ্গে হ্যামারস্মিথ অঞ্চলের লিরিক থিয়েটার-এর কথা মনে পড়ে। নতুন লেখকের নাটক এখানে সহানুভূতি পায়, নতুন ধরণের পরীক্ষাও এরা করেন মাঝে মাঝে। ফরাসী Existentialism-এর সঙ্গে এরা পরিচিত করান লণ্ডনকে Jean-Paul Sartre-র অদ্ভুত এবং আশ্চর্য নাটক মঞ্চস্থ করে'।

রঙ্গমঞ্চ বলতে আমরা বুঝি থিয়েটার, কিন্তু এখানে থিয়েটার রঙ্গ-জগতের অংশমাত্র। অপেরা, ব্যালে এবং কনসার্ট ইত্যাদির জনপ্রিয়তা নাটকের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এদের জাতীয় চরিত্রের এই দিকটা, আমার মনে হয়, কৃষ্টির এক অতি উচ্চ স্তরের নিশানা। ছেলে বুড়ো, আপিশের কেরানী, তরুণী টাইপিস্ট্ প্রকাণ্ড লম্বা লাইন বেঁধে দাঁড়ায় টিকিটের জন্য। তুপুরে খাওয়ার পরে ছুটির বাকি সময়টা কেউ অবশ্য কাটায় গল্প করে' বা রোদে বসে' —কিন্তু কেউ আবার যায় কনসার্ট-এ। গরিব লোকে অনেক হিসেব করে' পয়সা জমায়—হয়তো ক'দিন শুধু রুটি, চীস্ এবং কফি দিয়ে লাঞ্চ্ সারে—কনসার্ট-এর বাজনা, ব্যালে-র

নাচ এবং অপেরা-র গান শুনবার লোভে। বলা বাহুল্য, এগুলির কোনোটাই হালকা আমোদের জিনিস নয়, বরং সূক্ষ্ম রুচির খোরাক।

এই জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান দু'টি মঞ্চ দক্ষিণ কেনসিংটন-এর অ্যালবার্ট হল্ এবং কভেন্ট গার্ডেন-এ রয়াল অপেরা হাউস। অ্যালবার্ট হল্ গোলাকৃতি, লোক ধরে সাড়ে সাত হাজার এবং এতে মিটিং, বক্তৃতা, বক্সিং, ইত্যাদিরও আসর জমে মাঝে মাঝে। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় কিউ হয়েই আছে। গ্রীষ্মকালে অনেক দিন ধরে' চলে প্রমেনাদ কনসার্ট, দূরদূরান্তর থেকে লোক আসতে আরম্ভ করে দুপুর হতে না-হতে, কারো হাতে পত্রিকা বা বই, কারো স্যাণ্ডুইচ আর আপেল। সর্পাকৃতি লাইনটা ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট পেরিয়ে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে।

কিউ করার ক্ষমতা এ-জাতের অসাধারণ। রুটির দোকানের সামনে গৃহিণীদের সারি দেখলে না হয় বোঝা যায় সেটা পেটের দায়ে, কিন্তু চাইকভ্স্কি-র সুরস্রোত বা ইয়েহুদি মেনিউহিন-এর বেহালা কারো পেট ভরায় না; মনও ভরে না তাদের যারা 'গরম' বাজনা বা হালকা প্রমোদের পক্ষপাতী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পা টনটন করে, শীতে রক্ত জমে' যায়, তবু এরা হেসে' গল্প করে' সময়টা কাটিয়ে দেয়। যুদ্ধের পরে ১৯৪৬ সালে রয়াল অপেরা

হাউস যখন আবার খোলা হল সুপ্রসিদ্ধ Sadlers Wells ব্যালে সংসদের অনুষ্ঠান নিয়ে, তখন দেখা গিয়েছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। প্রথম রাতে আসবেন রাজ-পরিবার এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাদের জায়গা দিয়ে আসনের সংখ্যা আর খুব বেশী বাকি ছিল না। কিন্তু সেই ক'টি টিকিটের জন্য আগের দিন সন্ধ্যার থেকে জনাকয়েক দরজার কাছে যেয়ে বসলো। তখন ফেব্রুআরি-র প্রচণ্ড শীত, বরফ পড়ছে। তারি মধ্যে এরা কম্বল জড়িয়ে ঘুম দিলে। শুধু কিউ করার থেকে নয়, আরো অনেক ব্যাপারে এদের কষ্ট-সহিষ্ণুতার এবং ধৈর্যশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের তুলনায় এরা অবস্থাপন্ন জাত, কিন্তু যেখানে দীর্ঘ লাইনের শেষে পুরস্কারটা আমাদের কাছে মনে হবে তুচ্ছ—হয়তো আধ পাউণ্ড টোমাটো—এবং আমরা হয়তো ধৈর্য হারিয়ে লাইন থেকে বেরিয়ে আসবো, এরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সাগ্রহে, অক্লেশে। আদেখলার জাত—আমরা বলি মনে মনে।

যুদ্ধের পরে কৃষ্টি-মূলক কার্য-কলাপের দিকে আগ্রহ এদের আরো বেড়েছে। যেন দুর্ভিক্ষের পরে খাদ্যের স্বাদ পেয়েছে। বছরের পর বছর সেই দুর্দিনের ভয়াবহ নিষ্প্রদীপ রাত্রি-গুলিতে ছিল না উৎসবের সংগীত, ছিল বিপদের সংকেত। আমোদ আহ্লাদের জায়গাগুলি প্রায় সব বন্ধ; পর্দাঢাকা ঘরে বসে' রেডিওতে অফুরন্ত যুদ্ধ-সংক্রান্ত খবরের এবং

মন্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে অল্প-স্বল্প গান বাজনা শুনতে পাওয়া মানুষের একমাত্র আমোদ। হঠাৎ বাজলো বাঁশি ঢেউ-খেলানো সুরে—'ঐ এল ঐ এল' মন্ত্রে। রেডিও গেল মরে'। অতল স্তব্ধতা; তারপর প্রলম্বিত চিকণ লক্ষ্যভেদী আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে ঢুম ঢুম গুম গুম গুরুগম্ভীর শব্দ। হয়তো দূরে, হয়তো কাছে। কেঁপে উঠলো বাড়ি, আগুন লাগলো পাড়ার কোথায় যেন। আগুনের পাহারায় কাটতো অর্ধেক রাত; বাকি অর্ধেকে দুঃস্বপ্নজড়িত ঘুমের পর সকাল বেলা ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত মনে যেতে হত কাজে। যাবার পথে খবর-কাগজ খুলে পড়া একই চিরাচরিত হৃদয়-বিদারক দুঃসংবাদ। কোন্ সীমান্তে হটে' আসতে হচ্ছে, কোথায় নেই যথেষ্ট অস্ত্র বা সৈন্য—তারই অপরিবর্তন কাহিনী। আশার রেখা কোথাও নেই একটুখানি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত,—বছরের পর বছর। তারপর এল হিটলার-এর ব্রহ্মাস্ত্র—মহামারী ভি-বোমা। যাদের কাছাকাছি যেয়ে পড়তো তাদের দেহেরই মত ছিন্ন-ভিন্ন করতো দূরের লোকের মন। সে অমানুষিক অভিজ্ঞতা বর্ণনার অসাধ্য। প্রথমে মৃদু গুঞ্জন; দেখতে দেখতে এগিয়ে এল গুঞ্জন, পরিণত হল এক অদ্ভুত ক্রমবর্ধমান গর্জনে। আশ্চর্য এই শব্দটার প্রভাব! ঠিক যেন আমাকেই লক্ষ করে' এগিয়ে আসছে যমদূত। আসছে আসছে···এসে গেছে···ধরলো

ধরলো···। সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড যমের হিম-শীতল নিশ্বাস মুখের উপর পড়ছে। ধরলো ধরলো···আরো কাছে···আরো, আরো—তবু শেষ নেই। উঁচু জায়গা থেকে অনেকক্ষণ ধরে' পড়তে থাকার স্বপ্ন যারা দেখেছে, তারা কিছুটা কল্পনা করতে পারবে মনের ভাবটা। তারপর হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে আগুনের জিহ্বা আকাশ লেহন করলো। ঘাম দিয়ে দুঃস্বপ্ন ছাড়লো, মাটির পৃথিবীতে পা ঠেকলো।

আজো পুরনো দিনের প্রায় কিছুই এদের ফিরে আসেনি, অনেক ক্ষেত্রে অভাব আরো বেড়েছে যুদ্ধের দুর্দিনের চেয়েও। তাই যেটুকু পেয়েছে, আঁকড়ে ধরেছে সাগ্রহে। জামা কাপড় নেই বাজারে, নেই খাবার, মোটরের তেল ; কিন্তু আছে বই, থিয়েটার, অপেরা। লাইব্রেরিতে যাতায়াত বেড়েছে এবং সেখানে নভেল গল্প বাদ দিয়ে অন্যান্য বইএর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ লক্ষিত হয়েছে। নানারকম সান্ধ্য-স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা বেড়েছে,—তাদের অনেকেই আসছে শুধু শেখার জন্য শিখতে, পেটের জন্য নয়। কাগজের অভাবে বই ছাপা হচ্ছে সংখ্যায় কম, কিন্তু বইএর ব্যবসা আগের চেয়ে অনেক ভাল, কারণ অনেক বেশী দাম দিয়ে বেশীসংখ্যক বই লোকে কিনছে আজ। তাই, অপেরা হাউস-এর দরজায় তুষার-পাত তুচ্ছ করে' লোকে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে' থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা, তাও আশ্চর্য নয়।

বার্নার্ড শ-র প্রোফেসার হিগিন্স ফুলওয়ালী এলাইজা-কে বর্ণনা করেছিল—'যেন কভেণ্ট গার্ডেন-এর দলিত বাঁধা-কপির-পাতা'। সেটা পড়ার অনেক বছর পরে যেদিন কভেণ্ট গার্ডেন-এ পা দিলাম সেদিন সত্যিই প্রথমে চোখে পড়লো বাঁধাকপির দলিত পাতা। একটা দু'টো নয়, অজস্র—রাস্তার দু'পাশে। লণ্ডনের এটা প্রধান তরকারির বাজার। এবং যেহেতু এদের খাবার টেবিলে লাঞ্চে ডিনারে অহোরাত্রি সিদ্ধ বাঁধাকপি এক প্রধান উপকরণ, সেহেতু তরকারির বাজারে তারই প্রাত্যহিক রাজত্বের ভগ্নাবশেষ দেখবো এবং সেই পরিচিত গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত থাকবে তা আর আশ্চর্য কী। যাই হক, এরই মধ্যে বিরাট অট্টালিকা—রয়াল অপেরা হাউস। বাইরের থেকে ভিতরটা অনেকগুণ জমকালো। সব উঁচুতে গ্যালারি, তার নিচে অ্যামফি-থিয়েটার,—এমনি ছয় তলায় বিভিন্ন শ্রেণীভাগ। বিরাট মঞ্চের নিচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে অর্কেস্ট্রা-র স্থান।

একটা জিনিস লক্ষ করবার মত। ক্লাসিকাল গান বাজনা নাচের প্রতি এদের যতই প্রীতি থাক, এসব ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এবং স্রষ্টা ইংরেজদের মধ্যে চিরকালই কম য়োরোপ-এর অন্যান্য দেশের তুলনায়। এরই মধ্যে কিছুদিন আগে ব্যালেরিনা Margot Fonteyn চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। অপেরা রচনায় Benjamin Britten প্রসিদ্ধ

হয়েছেন Rape of Lucretia, Peter Grimes ইত্যাদি লিখে।

লণ্ডনের রঙ্গ-জগত সম্বন্ধে অনেক বলা হল। যারা 'বেড়াতে' বা 'দেশ দেখতে' আসেন তাদের এই জগতটার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু অতি মনোরম অভিজ্ঞতা। যারা দু'দিনের জন্য আসেন তারা সাধারণত যান উইণ্ড্‌মিল থিয়েটারে। তারপর মন দেন অন্যান্য চিরাচরিত আকর্ষণের দিকে—অর্থাৎ দেশ দেখার দিকে। সেদিক থেকে লণ্ডনের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য তার পাতাল-রেল। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই জটিল ব্যাপারটার মসৃণ সুনিয়ন্ত্রণ। একই স্টেশনে দু'তিনটে লাইনের গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে, কেউ যাচ্ছে উত্তরে কেউ দক্ষিণে, পুবে পশ্চিমে; একই দিকের লাইন আবার ভাগাভাগি হয়ে শাখা এবং প্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু তারই মধ্যে ঠিক গাড়ি ধরতে নবাগতেরও কষ্ট হয় না। বরং তাদের পক্ষে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে বাসের চেয়ে টিউবই সহজ, কারণ কোথায় নামতে হবে তা স্টেশনের নাম পড়েই বোঝা যায়। তাছাড়া, বাসের চেয়ে রেল দ্রুত,—দূরপথযাত্রীদের খুব সুবিধে সেটা। পাতাল-ট্রেন অবশ্য সর্বত্র সুরঙ্গ-পথেই চলে না,—শহরের ভীড় পেরিয়ে উঠে আসে মাটির উপরে, চলে মাঠ ঘাট ভেঙে।

নতুন ধরণের দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে Madame Tussauds

গ্যালারি উল্লেখযোগ্য। এখানে আছে খ্যাত ব্যক্তিদের মোম-মূর্তি। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মাঝে মাঝে। মাটির নিচে Chamber of Horrors, সেখানে কুখ্যাত যত খুনে ও নৃশংস অপরাধীরা স্থান পেয়েছে, সঙ্গে আছে তাদের ব্যবহৃত নানাবিধ যন্ত্রপাতি। এখানে সবচেয়ে নবাগত হচ্ছেন Neville Heath, কিছুকাল আগে যার ফাঁসি হল। অমায়িক এবং সুপুরুষ এই যুবকের ছিল আশ্চর্য যৌন আকর্ষণ। মেয়েরা সহজে ধরা দিত তার সযত্নবিস্তৃত মায়াজালে। কিন্তু সেটা মাকড়সার জাল। উপভোগের পর প্রেমিকের মুখোশ খসে' যেয়ে বেরোতো আততায়ী। হত্যার পদ্ধতিও ছিল অভিনব। সবশেষের মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেল সমুদ্রতীরের এক হোটেলের ঘরে,—গতরাত্রির প্রেম-শয্যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, উন্মুক্ত দেহে চাবুকের দাগ। মাকড়সার প্রণয়লীলাও অনেকটা এই রকম, তবে সেখানে পুরুষের কর্তব্য শেষ হবার পর স্ত্রী-মাকড়সা ভক্ষণ করে স্বামীকে।

বোমা-বিধ্বস্ত লণ্ডনের দৃশ্য দেখবার ইচ্ছে নিয়ে যারা আসেন তাদের হতাশ হতে হয়। মনে আছে যুদ্ধের প্রথম দিকে বার্লিন-বেতার শুনে, খবর-কাগজে 'ব্রিটেন-যুদ্ধের' বর্ণনা পড়ে' মনে হত লণ্ডনের অধিকাংশই বুঝি ধ্বংশ হয়েছে। তখন চার্চিল বলেছিলেন, জার্মানি যদি দশবছর প্রতিদিন

এই পরিমাণ বোমা ফেলে, তবু লণ্ডনের অর্ধেক বাড়ি অক্ষত থাকবে। সেদিন কথাটা নিছক গলাবাজি মনে হলেও পরে লণ্ডন দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় নি। অবশ্য বোমা এদের শারীরিক ক্ষতি খুব বেশী না-করলেও কষ্ট কম দেয় নি। সুরঙ্গ-রেলের স্টেশনে ক্রমাগত রাত কেটেছে হাজার হাজার লোকের। এর মধ্যে দেখা যেত কচি কচি সদ্যপ্রসূত শিশু; বিকেল চারটে থেকে পরদিন ভোর সাতটা পর্যন্ত দিনের পর দিন পাতাল-জগতে কাটতো ঐ দুগ্ধপোষ্যদের। সে এক অতি করুণ দৃশ্য! বোমা ধ্বংশ এনেছে মাটির উপরে অকস্মাৎ, কিন্তু মাটির নিচে তিলে তিলে দগ্ধে' মেরেছে তার তার চেয়ে কম নয়।

গোএরিং-এর আকাশ-বাহিনীর বিক্রম দেখতে হলে যেতে হয় রটারডাম-এ, লণ্ডনে নয়। লণ্ডনে ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হয়েছে পুব-মাথায়, বিশেষ করে' দরিদ্র-পল্লীতে। সেইণ্ট পল্‌স ক্যাথেড্রাল-কে ঘিরে আছে বহু ধ্বংশস্তূপ, কিন্তু পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই গির্জা গোএরিং-এর অনেক চেষ্টাসত্ত্বেও ছিল অপেক্ষাকৃত অক্ষত। এটা এদের মস্ত গর্বের বিষয়—এতে নাকি প্রমাণ হয় গত যুদ্ধে ঈশ্বর ছিলেন এদেরই দলে।

সেইণ্ট্‌ পল্‌স-এর আগে পরে পুরনো লণ্ডনের অনেক কিছু। ফ্লীট স্ট্রীট আধুনিক রাস্তা, অতি-নতুন গরম গরম

খবরের কারবার সেখানে। তার দু'পাশে সুপ্রসিদ্ধ Inns of Court, আইন আদালতের জগত। সেখানে কিন্তু সরু পাথর-বাঁধানো গলির আশেপাশে বহু শতাব্দী আগের বাড়ি; নিচু ছোট্ট কপাটের দু'পাশে ঝুলছে পৌরাণিক লণ্ঠন, ভিতরে অন্ধকার অলিন্দ। আধুনিক লণ্ডনের মধ্যে এ যেন ক্ষুধিত পাষাণের স্বপ্ন-জগত।

সেইণ্ট্ পল্স থেকে খুব দূরে নয় সেই প্রসিদ্ধ "এক বর্গ মাইল" যার নাম সিটি। স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কালো গুরুগম্ভীর বাড়িটা এর হৃদপিণ্ড। সারা পৃথিবীর ধনপতিদের প্রয়াস-ক্ষেত্র এই আদি-লণ্ডন দেখতে কুৎসিত। সরু পথের দু'পাশে প্রকাণ্ড কালো কালো বাড়ি, তাদের ঘোলাটে অন্ধকারে বসে' সারাদিন অসংখ্য কেরানী কলম চালায়। এই ক্ষুদ্র আদি-লণ্ডন চতুর্দিকের গ্রামদেশ গ্রাস করতে করতে প্রসারিত হয়েছে, সৃষ্টি করেছে মহানগর।

কাগজে কলমে

সেদিন বিকেলে নর্মা ডেকেছিল ওর বাড়িতে চা খেতে। বাড়ি মানে তিনতলার উপর একখানা মাঝারি ঘর, সঙ্গে ছোট্ট স্নানঘর এবং রান্নাঘর। রাস্তার দিকে আছে এক ফালি বারান্দা লণ্ডন শহরে আজকালকার দিনে তার একার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট পাড়ার নাম চেল্‌সি—বোহিমিয়ান চরিত্রের জন্য বিখ্যাত।

দেশ তার স্থন্দর ডেভনশায়ার-এ। এতকাল সেখানেই কেটেছে। তারপর কী কারণে হঠাৎ মাথায় ঢুকলো চাকরি করে' খাবে। লণ্ডনে এসে এক বন্ধুর চেষ্টায় কাজ পেল খবর-কাগজ আপিশে। কাজ এখনো কিছু বড় নয়, কিন্তু তার ইচ্ছে আছে রিপোর্টার হবে, সেজন্য ডাকে শিখছে জার্নালিজ্‌ম।

সময় ঠিক ছিল পাঁচটায়, কারণ তার আগে সে ছুটি পাবে না। যেয়ে দেখি সে রান্নাঘরে ব্যস্ত। বললে, 'একটু বস, আমার হয়ে গেছে।'

'অতিথির জন্য যথাযোগ্য আয়োজন হয়েছে কিনা দেখবো,' বলে' ঢুকলাম রান্নাঘরে। এক কোণে গরম হচ্ছে চাএর জল; অন্য দিকে থালায় সাজানো নানারকম বিলিতি পিঠে—কেক, স্কোন, সুইস-রোল। আরেক থালায় তিন কোনা করে' কাটা স্যাণ্ডুইচ-এর স্তূপ। এছাড়া, কাঁচের পাত্রে জড়ো করা রসালো সেলেরি-র ডাঁটা।

তারি একটায় কামড় লাগিয়ে বললাম, 'আয়োজন তো কম হয় নি দেখছি। 'উঁচু চা' বলেছিলে বটে কিন্তু তা যে এত উঁচু তা বুঝি নি। যাক, রাত্তিরে আর খেতে হবে না,—ল্যাণ্ডলেডি-র কিছু সুবিধে হল। তুমি ওটা কী বানাচ্ছো এত ব্যস্ত হয়ে? ও হরি, তোমাদের সেই আশ্চর্য 'বিরল কণা'—ওএল্‌শ্‌ রেআর-বিট*! তুমি রান্নার ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ী দেখছি; ওটা বুঝি ওভাবে বানায়!'

নর্মা চটে' যেয়ে বললে, 'তোমাকে এখানে কে ফোঁপরদালালি করতে বলেছে বলতো। বললাম ঘরে যেয়ে বস

* প্রধানত চীস, মাখন আর রুটি একত্রে ভেজে তৈরি। অপভ্রংশে 'ওএল্‌শ র‍্যাবিট'।

একটু। আর ঐ ডাঁটাটা চিবোতে আরম্ভ করলে কেন,—খেতে হয় টেবিলে বসে' তা জান না।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'এটুকু সইতে পার না তো চেল্‌সি-পাড়ায় বাস কর কেন? আমি শুধু বলতে যাচ্ছিলাম যে তোমাদের ঐ ওএলসীয় খরগোস জিনিসটা আমি কিন্তু খাই না। সুতরাং ওটার পিছনে অত পরিশ্রম তোমার না-করলেও চলতো।'

'আহা, আমি যেন আর খাবো না।'

'মেয়েদের বেশী খাওয়া ভাল দেখায় না। মোটা হয়ে গেলে শেষে বর জুটবে না!'

নর্মা হেসে বললে, 'মিস্টার স্ট্রেচি* থাকতে এখন আর আমাদের সে-ভয় নেই। খেয়ে মোটা হবার দিন বহুকাল চলে' গেছে। আচ্ছা এটা না-খাও, ঐ স্যাণ্ডুইচ খাবে তো; নানারকমের আছে—চীস, টোমাটো, স্যামন এবং মাংস। অনেক কষ্টে স্টিল্টন চীস যোগাড় করেছি—জানি ওটা তোমার পছন্দ।'

'সব খাবো, ভেবো না। আর মেঠাইএর থালাও তো রয়েছে। ওগুলি কিনবার এত পয়েন্ট পেলে কোত্থেকে?'

'ওসব আঁটঘাট আমরা মেয়েরা জানি। চল, আমার

* খাদ্য-মন্ত্রী

হয়ে গেছে। এইরে, জলটা বুঝি ফুটলো। কেৎলিটা নামাবে আমার হয়ে?'

'নিশ্চয়, তোমার জন্য এটুকু করবো না! দেখলে তো কেমন কাজে লেগে গেলুম, অথচ আমায় তাড়াবার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। অবশ্য এ অতি সামান্য কাজ, কিন্তু দরকার হলে তোমার জন্য—'

'আচ্ছা, আপাতত গ্যাস-টা বন্ধ কর তো,' খরখরে গলায় এই বলে' নর্মা বেরিয়ে গেল ছ'হাতে ছুই থালা নিয়ে।

সেদিন বিকেল থেকে ঝড়ো হাওয়া বইছে; শীত খুব বেশী না-থাকলেও হাওয়াতে হাড় কাঁপিয়ে দেয়। নর্মা-র ইচ্ছে ছিল বারান্দায় বসে, কিন্তু তা সম্ভব হল না। দরজা বন্ধ করে' ঘরে টেবিল সাজালে সে, বৈছ্যতিক হিটার জ্বেলে পাএর কাছে এনে বসালে। তখন বাইরে অন্ধকার জমে' আসছে। দমকা হাওয়ার দাপটে শার্শিগুলি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে, চিমনি-তে বাজছে ঝড়ের তীক্ষ্ণ চিকণ সুর। খাঁটি মার্চ মাসের আবহাওয়া।

চাএ চুমুক দিয়ে বললাম, 'ইংরেজের যে কী দিন এসেছে, বীয়ার-এ নেই তেজ, চাএ নেই স্বাদ। এই শীতের দেশে শরীরটাকে চাঙা করবার নেই কোনো রাস্তা; আমাদের দেশের ভাল চা কিছু আনিয়ে দেব তোমাকে, দেখবে চা কাকে বলে।'

'খালি তোমাদের দেশ আর তোমাদের দেশ—ও আর কত শোনাবে,' রুটিতে জ্যাম মাখাতে মাখাতে নর্মা বললে; 'একবার যেতে হবে ঐ সবপেয়েছি-র দেশে। ছেলেবেলার থেকে অনেক কিছু শুনেছি, দেখতে ইচ্ছে করে। একটা জিনিস আমার ভাল লাগবে নিশ্চয়—তোমাদের মেয়েদের অলংকার-প্রীতি। আমার খুব ইচ্ছে করে সারা দেহ গহনা দিয়ে মুড়ে রাখি। আর ভাল লাগবে তোমাদের কালো চুলের প্রাচুর্য এবং সাদা সুসমান দাঁত।'

'এত দিনে বোঝা গেল আমাকে কেন তোমার এত পছন্দ।'

'সেদিন সান্ধ্য কাগজে দেখছিলাম ভারতবর্ষে কোথায় যেন এক সাধু আছেন তিনি শুধু লোকের দিকে তাকিয়ে তাকে ছাই করে' দিতে পারেন। এ কি সত্যি?'

'সে আর কঠিন কি। বল তো আমিই তোমায় এক্ষুণি ছাই বানিয়ে দিতে পারি।'

'না, সত্যি বল না, ও রকম সাধু আছে নাকি তোমাদের দেশে।'

বললাম, 'তোমাদের সান্ধ্য কাগজ আমার কাছে এক অফুরন্ত বিস্ময়ের বস্তু। চমক দেবার কারসাজি ওদের চমৎকার।'

বিকেলে তিনটি কাগজ প্রকাশিত হয় লণ্ডনে। এদের

চরিত্রে মোটা রকম পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। খবর সম্বন্ধে তিনেরই নীতি মোটামুটি এক রকম—এক কথায় sensationalism বা চমকানি-নীতি। কে কার মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে পালালো, কোন্ বড় ঘরের বৌকে তার স্বামী ডিভোর্স করলেন পরপুরুষ-বিহারের অপরাধে, কে এক রহস্যময় হত্যাকারী একের পর এক সুন্দরী যুবতীদের খুন করে' চলেছে, কোথায় কোন্ এক মস্ত দোকানে দিনদুপুরে একদল ডাকাত বহু টাকার মাল লুট করে' উধাও হল, কে করেছে আত্মহত্যা অজানা কারণে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে মোটা মোটা হেডলাইন এবং সদ্য-তোলা গরম ফোটোগ্রাফ। এ ছাড়া কিছুটা খেলার বা সিনেমার খবর, এবং এক ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা সাম্প্রতিক খবর সম্বন্ধে খোশগল্পের মত রসরচনা। নতুন বই, থিয়েটার বা চিত্র-প্রদর্শনী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা অথবা ছোট গল্প কিংবা ঘরোয়া প্রবন্ধও থাকে মাঝে মাঝে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এমন দুর্নীতির এবং পাপাচারের দেশ বুঝি আর দু'টি নেই। সান্ধ্য কাগজের খবরের সাহায্যে এ-জাতির ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করার প্রয়াস অনেকের কাছে খুব উপভোগ্য জিনিস। এ ধরণের মূল্য-বিচার সহজ, কিন্তু সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। প্রথমত, যেসব খবর আমাদের দেশে পিছনের পাতায় ছোট করে' ছাপা হচ্ছে, এরা তাকে মোটা করে' স্থান দিচ্ছে সামনের

পাতায়, ঘটা করে' করছে বর্ণনা। হয় এটা বাড়িয়ে তোলা, নয়তো আমাদেরটা কমিয়ে বলা,—এই দুইএর তুলনা ঠিক চলে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে পাপ বা দুর্নীতি কম যদিও বা হয়, আমাদের জাতীয় পঙ্গুতা এবং দুর্বলতা কি তার একটা বড় কারণ নয়! আমাদের দেশে কাতারে কাতারে লোক চালের গুদামের দরজায় অনাহারে মরে তবু গুদামের তালা ভাঙতে চেষ্টা করে না। স্ত্রী যদি পরপুরুষের শয্যা-সঙ্গিনী হয়, তবু পবিত্র হিন্দু-বিবাহবন্ধনে বন্দী হয়ে থেকে শাস্ত্র রক্ষা করে' যেতে হবে।

রাজনৈতিক এবং বৈদেশিক খবর এবং জাতির সাংস্কৃতিক দিকটা এই সান্ধ্য কাগজগুলি তুচ্ছ করে; হয় ছাপে না, নয়তো ছোট করে' দেয় পিছনের দিকে। আশ্চর্য লাগে এই জন্য। কিন্তু চমকানি-নীতির এই একনিষ্ঠ পূজার পিছনে আছে সহজ ব্যবসাবুদ্ধি; দিনের শেষে লোকে চায় না অভাব অনটনের খবর বা তৃতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে জল্পনা। তারা চায় ঠিক এ-জিনিস-গুলিই ভুলে থাকতে এবং সেজন্যই দরকার 'নাটকীয়' সংবাদ।

'চমক লাগানোর কথা যদি বল,' নমা বলছিল, 'কোনো কোনো ভোরের কাগজও সেদিকে কম যায় না। তবে বলতে পার, তারা সান্ধ্য কাগজগুলির মত অতটা হালকা নয়।'

কিন্তু সে যাই হক, সকালে বিকালে খবর-কাগজ ছাড়া

ইংরেজ মৃতপ্রায়। এদের দৈনন্দিন জীবনে বোধহয় আর সব কিছুকে বাদ দে'য়া চলে (দিনকাল যা পড়েছে, সবই শেষে বাদ না পড়ে!), কিন্তু সংবাদপত্রকে নয়। এই আশ্চর্য জিনিসটার অপেক্ষায় দু'বেলা লম্বা সারি বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে যায় রেল স্টেশনে, ভূগর্ভে, রাস্তার মোড়ে। একটু দেরি হলে বুঝি ফুরিয়ে গেল।

কাজে যাবার সময়ে প্রাতঃকালীন এবং ফিরবার সময়ে সান্ধ্য কাগজ অন্তত একখানা হাতে চাই। ট্রেনে, টিউব-এ, বাসে মুখের সামনে মেলে সব বসে' আছে। সান্ধ্য কাগজ বেলা এগারোটার থেকে বেরোতে আরম্ভ করে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার সংস্করণ হয় বিকেল পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত। যুদ্ধ ক্ষান্ত হবার পরেও অনেককাল সেগুলি পাতে পড়তে পেত না, রাস্তায় বেরোনো মাত্র ছোঁ মেরে নিয়ে নিত লোকে। এর পরে কাগজ-পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হওয়ায় আজকাল সাধারণত সন্ধ্যার পরেও একটা না একটা কাগজ মেলে।

শুধুমাত্র খবরের নেশাই নয়, কিছুটা অভ্যাসের দাসত্বও আছে এই 'কাগজীয়' মনোবৃত্তির পিছনে। সবাই দল বেঁধে ছুটছে রেলের স্টল-এর দিকে, একটা পেনি ফেলে দিয়ে একখানা কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে বিজয়গর্বে বেরিয়ে আসছে ভীড় থেকে; দেখে অনেকবার আমিও যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করেছি গড্ডলিকা-বৃত্তির বশে। অধিকাংশ ডেইলি-প্যাসেঞ্জার

কাগজ কেনে সময় কাটানোর তাগিদে। আমাদের দেশে আমরা 'আপনি কদ্দূর যাবেন' বলে' পাশের লোকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিই, তাতে সময়ও কাটে পয়সাও বাঁচে। এদের এখানে সেটা রীতিবিরুদ্ধ। যে যার কাগজ নিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে ট্রেনের কামরায়—কি পুরুষ কি স্ত্রী। খবর পড়ার কোনো রকম প্রতিক্রিয়া—রাগ, বিরক্তি, ভয়, আমোদ, ইত্যাদির চিহ্নমাত্র নেই কারো মুখে। পড়া যখন ফুরিয়ে গেল তখন খুলে বসলো ক্রসওআর্ড ধাঁধা, নতুবা সঙ্গে আনা অন্য কোনো পাঠ্য। যাদের তাও নেই সেই হতভাগ্যরা জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে, নয়তো মাথাটি হেলিয়ে চোখ বন্ধ করলে।

ভোরের সংবাদপত্রে আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক খবরের স্থান ছোট নয় এবং থাকে সে-সম্বন্ধে আলোচনা ও সম্পাদকীয়। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রিকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। লণ্ডনে গোটা দশেক কাগজ আত্মপ্রকাশ করে প্রতি সকালে। একটি কম্যুনিস্ট্, একটি লেবার, দু'টি লিবার্ল, বাকিগুলির অধিকাংশই টোরি। কিন্তু এদের প্রত্যেকের এক একটা চরিত্র আছে। টাইম্স তিন পেনির কাগজ - এবং একমাত্র পত্রিকা যে যুদ্ধকালীন কাগজ-সংকটের দিনে প্রচার বাড়ানোর লোভে পৃষ্ঠা-সংক্ষেপ করেনি। টাইম্স টোরি দলের কাগজ জনমত বলে, কিন্তু তার

নিরপেক্ষতায় অনেক সময়েই সে-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। যাই হক, মতামত প্রকাশে এর নেই অত্যধিক উগ্রতা, ভাষায় নেই গালাগালির ঝাঁজ। বিবিধ বিষয়ে তথ্যপ্রসূত এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ, এবং খবরের পরিপূর্ণতা এর বিশেষত্ব। পাতাজোড়া মোটা হেডলাইন নেই, গুজবকে খবরের বেশে পরিবেশন নেই, ওবং তথাকথিত 'রসালো' খবরগুলি যদি বা স্থান পায় তো তার রসে কাগজটা চটচট করে না। টাইম্‌স-এর পরেই দু'পেনির কাগজ ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান; অনেকটা একই রকম তবে ধাতটা বাম-পন্থী। English liberalism-এর মহত্তম আদর্শের ধ্বজাধারী। তারপর দেড় পেনির কাগজ ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর চেহারাটা অনেকটা এদেরই মত, কিন্তু ডাই-হার্ড দলীয় উগ্র টোরি সে। এর নিচে সব এক পেনির কৃশ-কলেবর কাগজ—দুই কি তিন পাতা সবসুদ্ধ। ডেইলি হেরাল্ড বর্তমান গভর্মেন্টের মুখপত্র, লেবার-এর ছোঁয়া আছে তার চেহারাতেও। লর্ড বিভারব্রুক-এর ডেইলি এক্সপ্রেস এবং লর্ড রদারমায়ার-এর ডেইলি মেইল অনেকটা একই গোত্রের টোরি কাগজ। ব্রিটিশ জার্নালিজ্‌ম-এর ক্ষেত্রে এরাই সবচেয়ে 'কৃতকার্য'। এরা sensationalism-এর পূজারী; এই কাগজ-দুর্ভিক্ষের দিনেও সুবিধে পেলেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপবে যৌন-আবেদন বিতরণী নারীমূর্তি,—অন্যান্য কাগজের চেয়ে দ্বিগুণ বড় করে'। কোনো কিছুর বিরুদ্ধতা

করতে হলেই সম্পাদকীয় কলমটা ডোবানো হয় জ্বালা-ময় বিষে। এক্সপ্রেস-এর প্রচারসংখ্যা ৩৮,৫৫,০০০—সারা পৃথিবীতে প্রথম। ফ্লীট স্ট্রীটে তার বিরাট নতুন কাঁচমণ্ডিত প্রাসাদ অন্যান্য সব পত্রিকাকে লজ্জা দিচ্ছে। পেনি-কাগজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রম উদ্রেক করে লিবার্ল মুখপত্র নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌। সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ে সুমার্জিত প্রবন্ধ প্রায়ই থাকে। বাকি রইলো গ্রাফিক এবং মিরার। এরা অনেকটা পূর্বোক্ত সান্ধ্য কাগজ দলীয়। চমকদার ছবি এবং চটকদার খবরের প্রাধান্য। প্রধানত পাঠিকাদের উদ্দেশ্য করে' তৈরি।

এরা ছাড়া আছে রবিবারের কাগজ সব রকম দলের। তার মধ্যে নিউজ অব দি ওআর্ল্ড উল্লেখনীয়। যাবতীয় রসালো খবরের ভিতরকার খবর রসালোতর ভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হয় এতে। এই ভালগারিটি-র জন্য আপাত-নিন্দিত এই পত্রিকাটির রবিবারের প্রচারসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। এদেশের প্রতি তিন বাড়ির এক বাড়িতে নাকি যায় কাগজখানা। অভিজাতদের প্রাসাদেও যায়, তবে প্রথমে পাছদুয়ার দিয়ে চাকরানীর ঘরে, তারপর সেখান থেকে মিলেডি-র বুদোয়ার-এ।

নর্মা বললে, 'খবরের কাগজের প্রসঙ্গে ভাল কথা মনে

পড়েছে। তোমাদের ভাওয়ালপুর না কোথাকার নবাব এখানে এক রেলের-কুলির মেয়েকে বিয়ে করলেন সেদিন। কাগজে তাদের ছবি দেখে আমাদের আপিশে মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে' গেল। কার বোধহয় হিংসে হয়েছিল, সেটা আন্দাজ করে' তার এক বন্ধু বললে, এমন বিয়ের চেয়ে মরণ ভাল। এক পাল স্ত্রীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে' নিতে হবে স্বামীকে!…তর্ক লাগলো ভারতীয়দের সবারই অনেকগুলি বৌ থাকে কি না। আমি সেদিন ভেবেছিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো কথাটা, আজ মনে পড়েছে।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয় থাকে অনেক বৌ। আর রীতিটা আমার নিজের বেশ পছন্দ। বর্তমানে ইংরেজ মেয়েদেরই সবচেয়ে বেশী দরকার এ-নিয়মটা চালু করে' নে'য়া,—পুরুষের সংখ্যা কম হওয়াতে বর জোটানো যা দুঃসাধ্য তোমাদের পক্ষে। Half a husband—or even a quarter—is better than none।'

নর্মা মুখভঙ্গি করে' বললে, 'মাগো! আমি ও ভাবতেও পারি নে। কিন্তু তোমার ও-কথা আমি বিশ্বাস করি নে যে তোমাদের সবারই অনেকগুলো বৌ। আপিশের মেয়েদেরও আমি সে-কথাই বলেছি।'

এদের কাগজে ভারতীয় খবর যদি পাওয়া যায় তো সে খুব সংক্ষেপে—এক টাইম্‌স এবং ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান এ

ছাড়া। তবে যুদ্ধের পর থেকে ভারতে 'ড্রামাটিক' ঘটনা ঘটেছে অনেক, সুতরাং কখনো কখনো আমাদের সংবাদ এবং সে-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বা অন্যান্য প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে সব কাগজেই। সে সব প্রবন্ধের সুর কী রকম? উপরোক্ত পত্রিকাদু'টি এবং আর দু'একটি কখনো কখনো ছাড়া, দৈনিকদের সুর কারো নিরপেক্ষ ছিল না। কলকাতার সর্বনাশী দাঙ্গার সময়ে এরা সানন্দে বলেছে: 'দেখ এদের কী করে' স্বাধীনতা দে'য়া যায়,—আমরা না থাকলে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে শান্তিকরী প্রভাব আর কিছুই থাকবে না।' তারপর পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক বিপ্লবের পরে এরা অ্যাটলী-কে বলেছে: 'কেমন, বলেছিলাম না!' আমাদের ভারতীয়দের বলেছে, 'ইংরেজের 'অত্যাচারের' হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পেলে,—বোঝো এবার মজাটা!'

এই সময়ে ডেইলি মেইল পত্রিকার Ralph Izzard, ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর Colin Reed এবং Douglas Brown যত মিথ্যা এবং শয়তানী খবর ও প্রবন্ধ পাঠিয়েছে ভারত থেকে এদেশে এমন আর কেউ নয়। পাকিস্তানের প্রতি এদের অত্যধিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা কী কারণ প্রসূত জানি না,—বোধহয় কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া ছাড়া ওটা কিছু নয়। এদের মতামতের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, কিন্তু এরা সত্যকে এমন বিকৃত করেছে যা

না-পড়লে বিশ্বাস হতে চায় না। এবং এই বিকৃতি কখনো কখনো অজ্ঞতা-প্রসূত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তা নয় তা যে-কোনো ভারতীয়ের পক্ষে ধরা অতি সহজ। ঠিক তেমনি কঠিন ধরা ইংরেজ পাঠকের পক্ষে, যার উদ্দেশ্যে লেখা ওসব প্রবন্ধ। এ-জিনিসটা লেখকরা জানতেন এবং সেজন্যই লিখতেন ঐ রকম। তাদের সহায়ে freedom of the press-এর পবিত্র নীতি যার বিরুদ্ধে ভারত-সরকার অক্ষম; তাদের অনুকূলে ভারত সম্বন্ধে সাধারণ ইংরেজের প্রায়-নিরন্ধ্র অজ্ঞতা।

একবার আমার এক বন্ধুকে ট্রেনের এক সহযাত্রিণী জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'তোমরা কি ঘর-বাড়িতে বাস কর না গাছে?' এ-প্রশ্নে নির্দোষ কৌতূহল ছাড়া সত্যিই আর কিছু ছিল না। আর এক ভদ্রলোককে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আপ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন সিনেমা দেখিয়ে; বললেন: 'চল তোমায় একটা নতুন জিনিস দেখাবো যা দেশে কখনো দেখ নি।'

এই দৃষ্টান্তগুলি অবশ্য চরম। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে অজ্ঞতা এদের গভীর। তার কারণ, সাধারণ মানুষের অত সময় বা আগ্রহ নেই সাত হাজার মাইল দূরের তথ্য সংগ্রহ করবার। অস্পষ্টভাবে বোঝে, ভারতে তাদের রাজত্ব থাকাতে নিজেদের সম্মান এবং প্রতিপত্তি অনেক বেড়েছে; শুনেছে

দেশটায় অনেক পোকা-মাকড় এবং হিংস্র জন্তু, এবং মহারাজাদের অনেকগুলো বৌ এবং আরো অনেক টাকা। খবরের কাগজে যারা কাজ করে তারা একেবারে অশিক্ষিত নয়, সেখানেও তো তর্ক লাগে ভারতীয়দের ক'টা করে' বৌ তা নিয়ে!

সাধারণ লোকের কথা ছেড়েই দিলাম, তথ্যবিদ প্রসিদ্ধ লেখক অক্সফোর্ড-রত্ন Beverley Nichols-কে ধরা যাক। ইনি সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসে, on the spot সব দেখে শুনে তার 'রায়' দিয়েছেন। ইনি লিখেছেন: শান্তিনিকেতন পাহাড়ের উপরে দার্জিলিঙের কাছাকাছি অবস্থিত; অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সহোদর ভাই; বাংলার দুর্ভিক্ষে বাঙালীরা মরেছে তার কারণ তারা ভাত ছাড়া আর কিছু খাবে না; রবীন্দ্রনাথ বড়জোর এক "minor poet", ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, তথ্য-নিষ্ঠা যার এই প্রকৃতির, মতামতের ঔচিত্য সম্বন্ধে আরো উদাসীন হওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়।

সে যাক, এদের সাংবাদিক জগতে শিখবার আছে অনেক আমাদের সম্পাদকদের। সামান্য একটা শিরোনামার পিছনে এরা অনেকখানি মাথা ঘামায়; এদের তথ্যসংগ্রহ এবং সংরক্ষণ, এদের খবর সাজানো আমাদের অনুকরণীয়। মানি আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের কাগজ কিনবার পয়সা

নেই, কাগজ পড়বার শিক্ষা নেই, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের খবর-কাগজ আরো ভাল হতে পারতো। কল্পনাশক্তির দুর্বলতা —এমনকি অনুকরণেও শৈথিল্য—আমাদের সম্পাদকদের মস্ত বড় দোষ। সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক: এরা প্রথম পৃষ্ঠার অসমাপ্ত খবরের নিচে একটা সহজলক্ষ্য চিহ্ন দিয়ে খবরের শেষাংশ ছাপে শেষ পাতায় সেই একই চিহ্নের নিচে। কলকাতার কাগজের নিচে লেখা থাকে অমুক পাতায় অমুক স্তম্ভ দ্রষ্টব্য; ট্রাম বাসের ভীড়ের মধ্যে কাগজের মাঝামাঝি পৃষ্ঠা বা'র করা কঠিন, সেটা করার পর গন্তব্য স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেও সময় বেশী লাগে। অথচ এ-নিয়মটা সংশোধন করা খুব কঠিন নয়।

আমেরিকার জন-সংখ্যা এবং সম্পদ এদের চেয়ে অনেক বেশী, তাদেরও ভাষা ইংরেজি। তবু ভোরের কাগজ, সান্ধ্য কাগজ এবং রবিবারের কাগজ এ তিনেরই প্রচার-সংখ্যার রেকর্ড এদেশের কাগজের। এটা কম কথা নয়।

সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য সাময়িকপত্রের মধ্যে দৈনিক-গুলির মত সব জাতীয় পত্রিকা আছে, এবং তাছাড়া আছে লঘু গুরু নানা ধরণের সাহিত্য-পত্রিকা। এই দলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সিরিল কনোলি সম্পাদিত মাসিক Horizon। সাহিত্য এবং আর্টের ক্ষেত্রে নানা দেশের আধুনিক আন্দোলনের এবং প্রগতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এবং

সমালোচনা বহন করে এই পত্রিকা। এর আভিজাত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত কিন্তু বলা বাহুল্য এ-কাগজ সাধারণের জন্য নয়। সেই কারণে এর আট বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা —বিশেষত গত মহাযুদ্ধের ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে—বিশেষ আশ্চর্যজনক।

এই প্রসঙ্গে যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের সাহিত্যিকদের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নে'য়া যাক। যুদ্ধের পরেও বার্নার্ড শ এবং এইচ. জি. ওএল্‌স সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিভা। ১৯৪৬ সালের জুলাইতে শ' নব্বইর কোঠায় পা দিলেন। জন্মদিনের উৎসব-অনুষ্ঠানে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—এসব অত্যাচারেই আমাকে মারবে, বার্ধক্যে নয়। থাকেন লণ্ডনের অদূরে এক গ্রামে; বাড়ির বাইরে মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটি খুপরি বানিয়েছেন, তার মধ্যে বসে' লেখেন। রাজনীতির প্রতি মনোযোগ তার আজো অটুট, সাময়িক ঘটনার উপর লোক-চমকানো টিপ্পনী কাটেন প্রায়ই। সুবিধে পেলেই প্রচার করেন তার সোশালিজ্‌ম। বুদ্ধির ধার এখনো অক্ষুণ্ন। সম্প্রতি বিরানব্বই বছর বয়সে এক নতুন নাটক লেখা শেষ করেছেন। কুড়ি বছর বয়সে কপর্দকহীন 'অশিক্ষিত' শ' যেদিন দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন লণ্ডনের উদ্দেশে, আজ তার থেকে এসেছেন অনেক দূরে।

ওএল্‌স-ও জীবনযুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন সামান্য অবস্থায়,

দরজীর দোকানে শিক্ষানবিসির থেকে,—কিন্তু তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েছেন তিনি। উপাধির অভাব তার ছিল না, তবু ছিয়াত্তর বছর বয়সে খেটেখুটে লিখলেন থিসিস, যোগাড় করলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি। প্রধান লোভ তার ছিল রয়াল সোসাইটি-র সদস্য হবার দিকে। রয়াল সোসাইটি রাজকুমারী এলিজাবেথ-কে অন্তর্ভূ্ক্ত করতে পারেন কিন্তু ওএল্‌স-এর প্রতি ভ্রূকুঞ্চন করেন, কারণ তিনি বিজ্ঞানকে গল্পে-উপন্যাসে পরিবেশন করে' তার নাকি সম্মান হানি করেছেন। সুতরাং সে-আশা অপূর্ণ রেখে, শ'র নবতিতম জন্মদিন উৎসবের মাত্র ক'দিন পরে ওএল্‌স পৃথিবীর থেকে বিদায় নিলেন আশি বছর বয়সে।

সাহিত্যিক জগতে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি দেখান নি আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তি বা আবিষ্কার, কিন্তু তার ছিল প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক মন এবং চিন্তাধারা। এর প্রথম পরিচয় তিনি দেন উনত্রিশ বছর বয়সে তার Time Machine বইএ, তারপর ক্রমাগত আরো বহু গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে। অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের ত্রিশ বছর আগে লিখেছিলেন সে-সম্বন্ধে। তার শেষ বই Mind at the End of its Tether-এও সেই অনুশীলনী মনোবৃত্তি যার তাড়নায় মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও তিনি লিখে যেতেন নোট-বইতে তার রোগের বিবৃতি। চিরকালের আশাবাদী

ওএল্‌স শেষ জীবনে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা হারিয়েছিলেন।

মানুষের স্বার্থপরতা এবং আত্মঘাতী পাগলামির বাইরে প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছেন অল্‌ডাস হাক্সলি ক্যালিফর্নিয়াতে। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ। প্রথম যৌবনের হাক্সলি-র আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তার পরিণত বয়সের দর্শনের সঙ্গে যারা পরিচিত তারা তা জানেন।

সমারসেট ম'মও দেশ ছেড়ে উষ্ণ সূর্যের আওতায় গেছেন, দক্ষিণ ফ্রান্সে। তিনিও সম্প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন হিন্দুধর্মের দর্শনের দিকে। তার উপন্যাস The Razor's Edge ('ক্ষুরস্য ধারা') পড়লেও সেটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু এঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ছোট গল্পের ক্ষেত্রে। সেখানে তিনি আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ম'ম-র গল্পে কাহিনীটাই প্রধান, —যেসব আধুনিকরা গল্পে শুধুমাত্র সৃষ্টি করেন চরিত্র বা আবহাওয়া ইনি তাদের দলে ন'ন।

ই. এম. ফর্স্টার ছোট ছোট চারটি উপন্যাসের পরে ১৯২৪ সালে লিখেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ A Passage to India; এর পরে আর লেখেন নি কোনো উপন্যাস। তথাপি আজো জীবিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রগণ্য।

প্রবন্ধ এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে জর্জ অরওএল দক্ষ লেখক।

বুদ্ধিতীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ তার রচনা। সোভিয়েট রাশ্যাকে ব্যঙ্গ করে লেখা Animal Farm প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কাব্যাকাশে আজ অনেক তারকা এবং বিচিত্র তাদের রং। টি. এস. ইলিয়ট আজো সবচেয়ে বড় প্রতিভা। যুদ্ধকালীন কাব্যের মধ্যে তার Four Quartets সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি বিশ্বাস করেন কবি বা সাহিত্যিকের শিল্প-সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দায়িত্বের স্থান নেই। তাছাড়া, ট্রাডিশন-এর প্রতি তার আকর্ষণ আছে। এই কারণে অনেকের মতে তিনি escapist।

বয়সে এবং কাব্যদর্শনে ডব্লিউ. এইচ. অডেন সে-তুলনায় 'আধুনিক'। উনিশশো ত্রিশ দশকে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ-এ যে তরুণ কবিদের নিয়ে একটি কাব্য-সম্প্রদায় গড়ে' উঠেছিল, তাদের মধ্যে সেদিনও অডেন ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য, আজো তাই। এরা ছিলেন ইনটেলেকচুআল এবং বামপন্থী। এদের কাব্যে সমাজতন্ত্র ছিল প্রধান,—উপমা এবং শব্দ এরা সঞ্চয় করতেন কলকারখানা আর বস্তির পরিবেশ থেকে। আজ অডেন চল্লিশ পার হয়ে গেছেন; প্রতিভার দীপ্তি বয়সের সঙ্গে উজ্জ্বলতর হয়েছে। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত The Age of Anxiety তার সাক্ষী। অডেন অবশ্য এখন আর ইংরেজ নন; যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকায় বাস করেছেন, পরে ওদেশের নাগরিক হয়েছেন।

অডেন-এর পরবর্তী যুগে ডিলেন টমাস সবচেয়ে বড় কাব্য-প্রতিভা। বাড়ি ওএল্‌স, বয়স তেত্রিশ। বয়সে তরুণ ইনি, কিন্তু এর মধ্যে নেই বামপন্থী 'আধুনিকতা'। এর রচনায় প্রবৃত্তির দ্যোতনাই প্রধান, মস্তিষ্কের স্বাক্ষর নয়। এক কথায় ইনি রোমান্টিক কবি। ভাষা এবং শব্দের কারুকাজ এর আশ্চর্য সুন্দর।

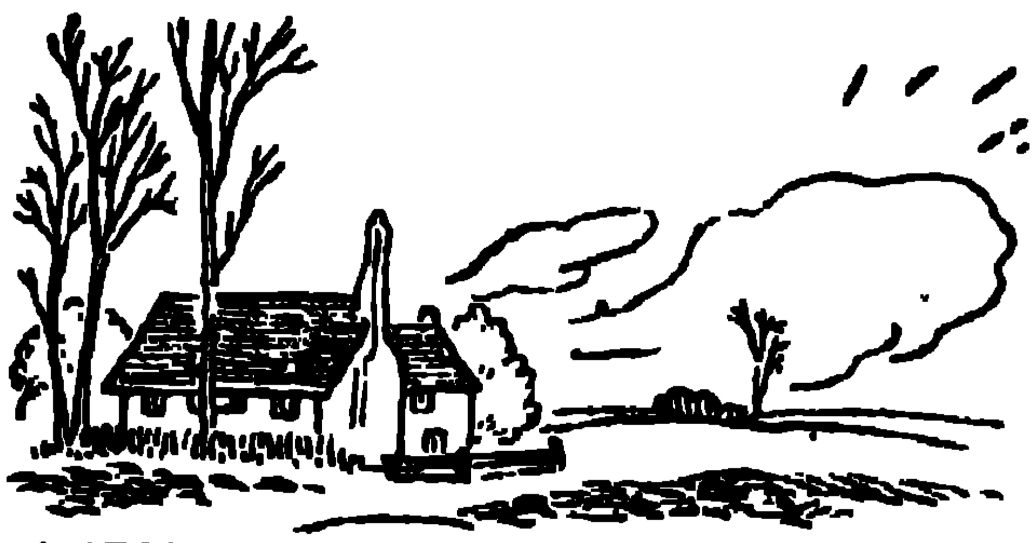

শহর থেকে অদূরে

সকাল থেকে রোদ উঠেছে ঝলমল করে’। আকাশে বাতাসে বসন্তের সাড়া। লোক-জনের মুখেচোখে খুশির ইশারা। কুয়াশা-ঢাকা অনেকগুলি দিনের পর হঠাৎ এই চকচকে রোদে পরিচিত রাস্তাঘাটের চেহারাও যেন বদলে’ গেছে।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ক্ষুধার্ত হয়ে সামনে পাওয়া গেল রাসেল স্কোয়ার অঞ্চলে লায়ন্‌স-এর দোকান। অপেক্ষা-কারীদের সারিটা তখনো খুব লম্বা হয়নি, দাঁড়িয়ে পড়লাম তার শেষে। এই ধরণের রেস্তরাঁগুলি গরিব এবং মধ্যবিত্তদের পক্ষে মস্ত সুবিধের জিনিস। এদের মধ্যে লায়ন্‌স কোম্পানি সবচেয়ে বৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ। পাড়ায় পাড়ায় তার অসংখ্য রেস্তরাঁ। আহারান্বেষীরা সারি বেঁধে চলে সাজানো খাবারের

পাশ দিয়ে, যার যেটা খুশি সে-থালাটা তুলে নেয় ট্রে-তে; অবশেষে যে-মেয়েটি হিসেব করে' দাম নেয় এবং নজর রাখে বরাদ্দর বেশী খাবার নে'য়া হল কিনা তাকে পেরিয়ে সাজানো টেবিল চেয়ারে এসে বসে। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরানীরা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খালি বাসনপত্র, মুছে দিচ্ছে টেবিল। বকশিশের বালাই নেই, খাবারের দাম সস্তা; চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায় এবং সঙ্গে দাম লেখা থাকে সেজন্য পছন্দ করতেও সুবিধে। এসব দোকান বৈকালিক চাএর পর বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এদেরই গোটাচারেক বড় রেস্তরাঁ আছে যেখানে রাতের ডিনার মেলে। এখানে নিজেকে নিজে পরিবেশন করতে হয় না এবং বাজনা শুনে পেটের সঙ্গে কানও জুড়ানো যায়।

কোথাও কোথাও যান্ত্রিকতার সাহায্যে শ্রম এবং সময় বাঁচে আরো। ট্রে-কে একমাথায় চলন্ত পথে বসিয়ে দিলে সে চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে, কাজের মধ্যে শুধু থালা তুলে নে'য়া। সম্প্রতি আরেকটি কল উদ্ভাসিত হয়েছে—যদিও এখনো কাজে লাগানো হয় নি—তাতে নাকি খাদকের সামনে একটার পর একটা থালা এসে উপস্থিত হবে হিসেব করা বাঁধা সময়ের পরে পরে। সুতরাং খাওয়া নিয়ে বেশী দেরি করা চলবে না। সব খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরে সিগারেটটি ধরিয়ে সান্ধ্য পত্রিকা খুলে আধঘণ্টা বসে' থাকারও উপায়

নেই,—এক যান্ত্রিক হাত এসে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে ঠেলা দিয়ে তুলে দেবে, মনে করিয়ে দেবে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে জায়গার অভাবে।

অনেকখানি এগিয়ে এসেছি এমন সময়ে চোখে পড়লো আমাদের ডিউক কাছেই এক টেবিলে বসে' খাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড-এর ক্রসওআর্ড ধাঁধার ঘরপূরণ করছে। আমার ডাকে তার টনক নড়লো, তাড়াতাড়ি সামনের খালি চেয়ারে ওর মোটা মোটা ছু'টো বই রেখে জায়গা দখল করলে।

খেতে বসে' বললাম, 'তুমি অতীব কৃপার পাত্র, ডিউক। এমন দিনটাও পড়াশুনো করে' নষ্ট করছো। সঙ্গের বইগুলি দেখে মনে হচ্ছে সারা সকালটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কেটেছে। তোমাদের হতভাগা দেশে এমন রোদ রোজ ওঠে না তা জান না!'

ডিউক আমার বক্রোক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করলে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চীস আর রুটি চিবিয়ে। তারপর বললে, 'আমি আবহাওয়ার দাস নই, বৃষ্টি বাদলের মধ্যে স্নোডন পাহাড়ের চূড়ায় চড়েছি। কলেজ ছুটি হতে দাও জুলাইতে— প্রতিবারের মত এবারও বেরোবো। পড়ার সময়ে পড়া, খেলার সময়ে খেলা—কি রোদ কি বৃষ্টি।'

'এর চেয়ে বিরস দৃষ্টিভঙ্গি আর কিছু নেই জগতে।

তোমাদের জাতের ঐ বড় দোষ—কল্পনাশক্তির অভাব। 'সর্বদা সোজা পথে চলিবে'। যাক, এবার কোন্ দিকে যাচ্ছ, মাটারহর্ন শৃঙ্গ জয় করবে নাকি ?'

'এখনো ঠিক নেই, জ্যানেট বলছে লেক ডিস্ট্রিক্ট। মাটারহর্ন-এ চড়তাম ঠিকই যদি না কারেন্সি-সংকটের জন্য বিদেশে যাওয়া এত কঠিন হত। তা একদিন চড়বো, দেখে নিয়ো।'

জ্যানেট ওর গার্ল-ফ্রেণ্ড, এক ক্লাসে পড়ে। একবার আলাপ হয়েছিল, বেশ হৃষ্টপুষ্ট সরল মেয়েটি। পাহাড়ে চড়ার নেশা দু'জনেরই প্রচণ্ড। মাইলের পর মাইল হেঁটে, বোঁচকা কাঁধে করে' পাএ পাএ ওঠে পাহাড়ের গা বেয়ে।

'চল না এবার তুমি আমাদের সঙ্গে,' হঠাৎ ডিউক বললে।

'আমি! রক্ষে কর বাবা। পাহাড়ে উঠলে আমার বুক ধড়ফড় করে।'

'জ্যানেট-এর মত মেয়েরা উঠছে আর তুমি—'

'আর বলো না,' যথোচিত লজ্জার ভান করে' বললাম, 'ভাত খেয়ে মানুষ হয়েছি কিনা! ছোট বেলার থেকে তোমাদের মত ষাঁড় খেতে পেতাম তবে দেখতে।'

'জানি, তোমার দলের লোক এদেশেও অনেক আছে। এরা সর্বদা সমতল ভূমিতে বিচরণ করে,—পাহাড়ে উঠতে এদের মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে। পাহাড়ের উপরের

বাতাস যে কত পবিত্র, পরিশ্রমের পর সে যে কত বড় পুরস্কার এরা তা জানে না। এই হতভাগ্যরা হাঁটতেও নারাজ; এরা বেড়াবে ট্রেনে, কোচ-এ, মোটরগাড়িতে। এদের মস্ত বড় আকর্ষণ সমুদ্র, যেন তার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কিছু নেই প্রকৃতিতে!'

ওর কথার সুরে সুর মিলিয়ে বললাম, 'পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দে'য়া উচিত এদেরকে, তবে যদি টের পায় রোমাঞ্চ। কিন্তু ভাই, স্বপ্নে আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছে বহুবার—ওতে আর দরকার নেই। স্বপ্নের শেষে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, বাস্তব জীবনে রক্ত দিয়ে প্রাণটা ছাড়তে হবে।'

'এসব সমুদ্র-বিলাসীদের সমুদ্রে ডুবে মরা উচিত,' ডিউক বললে।

'অত ঠাট্টা করো না। শেলি সমুদ্রে ডুবে মরেছিলেন; কোন্ বড় ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে' মরেছেন বলতে পার?'

'এই অকাট্য যুক্তির সামনে আমাকে মানতেই হবে যে সমুদ্র বড়। আচ্ছা এবার আমি চলি, একটা লেকচার আছে।' বলে' সে বিদায় নিলে।

শীতের দেশ, কিন্তু সমুদ্রতীরের নেশা এদের সত্যিই দেখবার মত। লণ্ডন অঞ্চলে যারা আছেন তাদের আছে ব্রাইটন, বোর্নমাথ, ইস্ট্‌বোর্ন। বৈদ্যুতিক ট্রেনে দু'চার ঘণ্টার দূরত্ব। শুক্রবার বিকেলে ভিক্টোরিয়া এবং চেআরিং ক্রস

স্টেশনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভীড়,—সুটকেশ হাতে করে' ছুটেছে সমুদ্র আর সূর্যের নেশায়। সান্ধ্য কাগজ কিনে দেখছে সপ্তাহ-শেষের আবহাওয়া কী রকম হবে। রোদ না বৃষ্টি, রোদ না বৃষ্টি—সারা সপ্তাহ এই দ্বিধায় দুলেছে মন।

ছোট ছোট সাজানো গোছানো এসব শহর গড়ে' উঠেছে সমুদ্রের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে'। উঁচু নিচু ঢালু রাস্তা, পথঘাট ঘরবাড়ি পরিষ্কার ঝকঝক করছে। প্রশস্ত বীচ-এর উপরে প্রমেনাদ, তার পাশে নানারকম প্রমোদকেন্দ্র,—রেস্তরাঁ, নাইটক্লাব, হোটেলের ছড়াছড়ি। আশেপাশে স্নানামোদীদের জন্য নানারকম সুখসুবিধার ব্যবস্থা।

সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত নীল অতলান্তিক চোখ জুড়িয়ে দেয়। শুধু মাঝে মাঝে ছন্দপতন করে দূর-প্রসারিত pier-গুলি—অতিকায় কোনো সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কালের মত দেখতে। জলে ঝাঁপাঝাঁপি করছে ছেলে মেয়ে বুড়ো শিশু, স্থলে কেউ ডেক-চেয়ারে কেউ বালিতে বসে' আলস্যে মজ্জমান; কেউ খবর-কাগজ পড়ছে, কেউ চোখ বন্ধ করে' রোদের মাদকতা শুষে নিচ্ছে সারা দেহে। বাচ্চারা বানাচ্ছে বালির দুর্গ, কিংবা চুষছে আইস-ক্রিম ললি-পপ। একটু যখন গরম পড়ে আর রোদ ওঠে ভাল করে' তখন লোকের ভীড়ে বীচ-এর বালি দেখা যায় না। এদের অনেকেই জলে নামে না, সাঁতার জানে না—কিন্তু তাতে কী এসে যায়!

ব্রাইট্‌ন বোর্নমাথ-এর সমুদ্রের চেয়ে আমাদের পুরীর উপকূল অনেক চমৎকার। সেখানে ভাঙা-তরঙ্গের তিনটে প্রলম্বিত সাদা রেখা যখন প্রচণ্ড গর্জনে মুহুর্মুহু এসে আছড়ে পড়ে পাএর কাছে, মনে হয় যেন বিরাটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। এখানকার সমুদ্রের নেই সে-তেজ সে-সৌন্দর্য —কিন্তু তবু ব্রাইটন-এর সঙ্গে পুরীর কি তুলনা চলে! পুরীর সমুদ্রটুকু বাদ দিলে যা থাকে তা কুৎসিত এবং নোংরা: আমাদের অনেক আছে, কিন্তু আমরা তার উচিত মূল্য দিই না, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করি। প্রকৃতি এদের প্রতি কৃপণ, কখনো বা নির্দয়—কিন্তু এরা যেটুকু পায় তাকে যথাসম্ভব ভোগ করে' নেয়। শুধু সমুদ্র নয়, এদের প্রাকৃতিক এবং পারিবারিক অনেক কিছু দেখেই সে-কথা মনে হয়েছে। অল্পকে বড় করে' নেবার এই আগ্রহ দেখে আমাদের মনে হয় এরা আদেখলার জাত,—কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে কোথায় যেন আছে মানুষ-হৃদয়ের অতি-পুরাতন সুন্দর এক প্রবৃত্তির ইশারা।

ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের সৌন্দর্য জগদ্‌বিখ্যাত। সমুদ্রের চেয়ে আমার এদিকটা ভাল লাগে আরো বেশী। ঢেউ-খেলানো উন্মুক্ত প্রান্তর, ছোট ছোট টিলার মত পাহাড়, হয়তো কোনো শান্ত নদী, মাঝে মাঝে দু'চারটে কুটির—ছবির মত স্তব্ধ, সুন্দর। অনেকগুলি গ্রাম বা অনেকখানি প্রান্তর পেরিয়ে এক একটা ছোট শহর; তাতে অল্প

লোক, নেই গোলমাল, নেই কলকারখানা—কিন্তু আছে আরামে বাস করবার সুযোগ সুবিধা। আছে ঝকঝকে পরিষ্কার মসৃণ রাস্তা, সাজানো দোকান বাজার, লাইব্রেরি, টাউন হল্, পার্ক, গির্জা, টেলিফোন, রেডিও, গ্যাস, বিদ্যুত।

বেড়াবার প্রকৃষ্ট সময় গ্রীষ্ম এবং বসন্ত কাল, যখন ফুলে ফলে সবুজে ঢেকে যায় চারিদিক, যখন দিনের শেষে অন্ধকার হয় অনেক দেরিতে (জুন মাসে রাত এগারোটায়), যখন রোদ ওঠে বেশী এবং বাতাসের তাপ থাকে এমন যাতে হাড়ও কাঁপায় না ঘামেও ভেজায় না। চলাফেরার সুবিধে আমাদের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। পিচ-বাঁধানো রাস্তা সারা দেশটার প্রতি কোণে কোণে ডালপালা ছড়িয়েছে, বাস চলে চতুর্দিকে দূরে দূরান্তরে। বাসের ভিতরে যেমন আরাম, তারা চলেও তেমন মসৃণ গতিতে। এদেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত দূরগামী বাসে অর্থাৎ কোচ-এ বেড়িয়ে আসা কষ্টকর বা কঠিন নয়। এবং বাসে করে' যাওয়া চলে যে-কোনো গ্রামের অন্তঃপুরে।

ট্রেনের ভাড়া বেশী। তেমনি এদের তৃতীয় শ্রেণীর আরাম আমাদের প্রথম শ্রেণীর চেয়ে কম নয়। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর সুন্দর মাপকাঠি এদের এই তৃতীয় শ্রেণীর কামরা; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পুরু নরম গদি, ঘর গরম রাখবার ব্যবস্থা, চলন্ত গাড়িতে করিডর দিয়ে রেস্তরাঁ কার-এ যাতায়াতের

সুবিধা। যুদ্ধের মধ্যে সৈন্য চলাচলের জন্য ট্রেনে চড়া কষ্টকর ব্যাপার ছিল,—এইনো ১৯৩৯-এর অবস্থা ফিরে আসে নি, কিন্তু চলাফেরা অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় দ্রুতগতি all-Pullman গাড়ি চলছে আবার, আসছে কাঁচমণ্ডিত অবজারভেশ্যন কার। আন্দাজ করা যায় যুদ্ধের আগে এদেশের সাধারণ জীবন আরামের অতি উচ্চ স্তরে উঠেছিল।

ট্রেনে চলাটা এখানে আমাদের দেশের মত ভীতিকর ব্যাপার নয়, দুঃস্বপ্নের উদ্রেক করে না। ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি নেই, কুলি ডাকাডাকি নেই; অধিকাংশ লোকই নিজের মাল নিজে বইছে; মেয়েরা পর্যন্ত দু'হাতে ভারি ভারি বাক্স নিয়ে চলেছে। বিছানা কেউ সঙ্গে নেয় না, এ একটা মস্ত সুবিধা। গাড়িতে জায়গা থাকা সত্ত্বেও ঢুকবার জন্য মারামারি করতে হয় না, জায়গা না থাকলেও লোকে সরে' দাঁড়িয়ে রাস্তা করে। ভীড়ের ঠেলাঠেলিতে লোকে দুঃখ প্রকাশ করে' মাপ চায়, নির্দোষ রসিকতা করে—গালাগালি দেয় না।

বাসের থেকে প্রকৃতিকে উপভোগ করা যায় ভাল। সকাল বেলা কোনো একটা গন্তব্য স্থান উদ্দেশ্য করে' বেরোলে গ্রীষ্মের দিনে একশো মাইল কি তারও দূরে ঘুরে আসা কঠিন নয়। শহরগুলি ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মাঠ ঘাট পল্লীপাড়া। চড়ুইভাতি করা যায় গিয়ে হুইপস্নেড চিড়িয়া-

খানায় যেখানে অর্ধ-প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে জানোয়াররা বাস করে। যাওয়া যায় সারা পৃথিবীর ছাত্রদের তীর্থক্ষেত্র অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে। অধ্যয়নকে যারা তপস্যার মত মেনে নিতে চায় তাদের পক্ষে সত্যিই উপযুক্ত ক্ষেত্র এছু'টি জায়গা। বহু কালের পুরনো সব বাড়ি, সংকীর্ণ নিচু দরজা, অন্ধকার সিঁড়ি, ফাটা ছাল-ওঠা দেয়াল, নক্সাকাটা রঙিন কাঁচের জানলা। ঘরের ভিতরে আধুনিক সুখ সুবিধা প্রায় সব রকম আছে। শোবার ঘরে বেসিন, জল গরম করবার গীজার, ওআর্ড্রোব; বসার ঘরে বইএর তাক, ছু'টি নরম কৌচের মাঝে ছোট টেবিল আগুনের পাশে। জানলা দিয়ে দেখা যায় নিরিবিলি মাঠ। প্রতি কলেজের এ-ই বিশেষত্ব,—পিছন দিকে অনেকখানি খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে গাছ বা ছোট ছোট ঝাড়। এখানে এই ঘাসের উপর পায়চারি করতে করতে চলে জটিল তত্ত্বের অনুশীলন, গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকে ধ্যানমগ্ন ছাত্র। নেই কলরব, নেই ভীড়। কেম্ব্রিজে একুশটি কলেজের পিছন দিয়ে বয়ে গেছে ক্যাম্ নদী। নদী বলতে আমরা যা বুঝি এ তা নয়—কোনো কোনো জায়গায় লাফিয়ে পার হওয়া যায়। এদেশে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—এরা নালাকে বলে নদী, টিলাকে বলে হিল্; এবং অতি জমকালো নাম দেয় তাদের। ক্যাম্ নদী ছোট কিন্তু অতি সুন্দর। সে নয় চোখ-ধাঁধানো

আধুনিক যুবতী, সে পাড়াগাঁ'র সহজ মেয়ে, এঁকে বেঁকে চলেছে মাঠের মধ্য দিয়ে। দু'ধারে ঝুলে পড়েছে weeping willow। তারই ফাঁকে ফাঁকে রোদ চিকচিক করছে জলে; ছেলেরা চলেছে নৌকা বেয়ে। মাঝে মাঝে সেতু; তার মধ্যে সেইন্ট জন্‌স কলেজের bridge of sighs প্রসিদ্ধ; প্রবাদ, পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য তারা এখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে' "ব্যর্থ জীবন" শেষ করতো। এর পাশেই ট্রিনিটি কলেজ—সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে স্বনামধন্য, জওয়াহরলাল নেহেরু-র শিক্ষাতীর্থ। তারপর ক্রাইস্ট চার্চ, কিংস্, কুইন্‌স, আরো কত! অক্সফোর্ডে যেমন ব্যালিয়ল, জীসাস, ট্রিনিটি, ক্রাইস্ট চার্চ, মার্টন, ইত্যাদি। ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, বৈদগ্ধে প্রসিদ্ধ। এ-জাতের সবকিছুতে—বিশেষত শিক্ষায়তনে—ঐতিহ্যের উপাসনা লক্ষণীয়। ইটন-এ এখনো পুরনো স্কুল-বাড়ির একখানা ধ্বংশোন্মুখ ঘরে কোনো কোনো ক্লাস বসে; কয়েকশো বছর আগের বেঞ্চিতে এবং ডেস্কে ছুরি দিয়ে খুদে' নাম লিখেছে কত বংশ পরম্পরার ছাত্র, জানলার কাঁচে কত বালকের সযত্ন-সংরক্ষিত স্বাক্ষর—যারা পরে হয়েছে হয়তো দেশের প্রধান মন্ত্রী বা দিগ্বিজয়ী লেখক।

কলেজ প্রাঙ্গনের থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিলে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ অন্যান্য যে-কোনো ছোট শহরের মতই আধুনিক। তাছাড়া, বিজ্ঞান-অংশের নতুন বাড়িগুলিতে

পুরনো গন্ধ নেই কিছু। সেখানেও ঐতিহ্য গড়ে' উঠছে। পেনিসিলিন-এর জন্য বিখ্যাত অক্সফোর্ড; কেম্ব্রিজেও—বিশেষ করে' জৈব রসায়নে—আছেন অনেক নামকরা বৈজ্ঞানিক।

অধ্যয়ন বা গবেষণার প্রতি যারা বিশেষ আকৃষ্ট নয়, ছুটির দিনে যারা শহর ছেড়ে বেরোতে চায় ঐতিহাসিক রোমাঞ্চের খোঁজে তাদেরও যাবার জায়গা আছে লণ্ডনের কাছাকাছি। আছে হ্যাম্প্‌টন কোর্ট—টেম্‌স-এর তীরে 'সুবিখ্যাত' অষ্টম হেনরি-র প্রাসাদ ও উদ্যান। অথবা উইণ্ডসর দুর্গ, ইংলণ্ডের বহু রাজার বাসভূমি, সযত্ন-রক্ষিত কত আসবাবপত্র অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ।

উইল্টশায়ার প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংশাবশেষ stone-henge (অর্থ: ঝুলন্ত পাষাণ) লণ্ডনবাসীদের পক্ষে খুব দূরে নয়। রাস্তায় আটশো বছরের পুরনো, গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন সল্‌সবেরি ক্যাথিড্রাল দেখে নে'য়া যায়। তার অদূরে সুবিখ্যাত সল্‌সবেরি প্রান্তর,—প্রায় আটশো বর্গমাইল জুড়ে সমতল জমি। এই ধু ধু প্রান্তরের মাঝখানে অবস্থিত চার হাজার বছর আগের মানুষের সূর্য-উপাসনার মন্দির—অন্তত, তাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এর স্থাপত্য অত্যন্ত সরল, এঞ্জিনিয়ারিং কঠিন। লম্বা লম্বা পাথরের চাক মাটিতে কিছু দূরে দূরে গেঁথে বানানো হয়েছে তিনটে বৃত্ত, একটার

মধ্যে আরেকটা। প্রথম এবং তৃতীয় বৃত্তের প্রস্তরগুলির যে দুই-তৃতীয়াংশ মাটির উপরে উঠে আছে তা অনেক উঁচু। সেই উঁচুতে পাশাপাশি স্তম্ভের মাথায় খাঁজ কেটে আড়াআড়ি বসানো আছে আরেক খণ্ড করে' পাথর। এগুলির কিছু কিছু ধ্বসে পড়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ঠিক জায়গায় আছে আজো। সেই আদিম কালের লোকেরা এই প্রকাণ্ড পাথর-গুলি কী করে' নাড়াচাড়া করেছে তাই নিয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করেছেন। তারা অনুমান করেন খাড়া পাথরগুলিকে তুলবার জন্য আগে খণ্ডটার এক মাথার নিচে একটা খাদ কাটা হয়েছে, তারপর অন্য মাথাটা দড়ি বেঁধে টানা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদটা ভরাট করা হয়েছে মাটি দিয়ে। মাথার পাথরগুলি তোলা হয়েছে ঢালু মাটির উপর দিয়ে টেনে, পরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এ মাটি। মনে পড়ে, পৌরাণিক ভারতবাসীরাও যে এই ধরণের সমস্যার সমাধান করেছে—হয়তো বা আরো বেশী কৌশল ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে—অনেক মন্দিরে স্তম্ভে নিদর্শন আছে তার।

জ্যোতির্বিদ্যা যে কিছু কিছু জানা ছিল এই সূর্য-উপাসকদের তার চিহ্ন পাওয়া গেছে। মধ্যগ্রীষ্মের এবং মধ্যশীতের উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্যের অবস্থান চিহ্নিত করে' এরা গেঁথেছিল কতগুলি পাথর। বস্তুত তাই থেকে নির্ধারিত হয়েছে এ-মন্দিরের বয়স; কারণ এই চিহ্নের থেকে

সূর্য এখন সরে' গেছে এক ডিগ্রি, এবং জ্যোতির্বীরা জানেন সেটা হতে লাগে চার হাজার বছর।

মন্দিরের মাঝখানে এক বেদি। বাইরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা স্তূপ,—কবর-দে'য়া বা দাহ-করা দেহের সমাধি। তাছাড়া দেখা যায় কতগুলি প্রস্তরখণ্ড, সম্ভবত মানুষ-বলির বেদি। এ সমস্ত পাথর এদেশে পাওয়া যায় না, আনা হয়েছিল বোধহয় উত্তর আফ্রিকা থেকে, এভন নদী বয়ে। ভাবতে অবাক লাগে কী আশ্চর্য অধ্যবসায় সেই আদিম নিওলিথিক মানুষের—মানুষ বলি দিয়ে সূর্য-স্তুতির জন্য! কত হতভাগ্যের আত্মা আজো এই ক্ষুধিত পাষাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কে জানে! অনেক লোকের দৃঢ় বিশ্বাস স্তম্ভগুলি কালস্রোতের সঙ্গে ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে এবং এখনো বাড়ছে। তারা প্রতিজ্ঞা করে' বলবে দশবছর আগে আমি নিজেই দেখেছিলাম এর চেয়ে বেশ ছোট। বৃদ্ধির জন্য এদের গোড়ায় নাকি জল ঢালা হয় এমন কথাও পাড়াগাঁ'র লোকে বলে।

এভন নদীর কথায় ভিন্নজাতের আরেকটি স্মৃতি-তীর্থের কথা মনে পড়ে। লণ্ডন থেকে নব্বই মাইল দূরে স্ট্রাটফোর্ড-অন-এভন। শেক্‌সপীয়র-এর জন্ম ও মৃত্যু-স্থান। সেকালে ছিল পাড়াগাঁ, এখন সুন্দর ছোট্ট শহর। এখানে সেখানে পুরনো ধরণের বাড়ি আছে অনেক—ছবিতে যেমন দেখা

যায়। মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে এভন নদী—শীর্ণা কিন্তু সুন্দরী। 'অশ্রুঝরা উইলো' ও অন্যান্য গাছের ছায়ায় ছায়ায় ছোট একখানি নৌকা বয়ে যেতে বেশ লাগে। এ-দৃশ্য নিশ্চয় ছিল কবির মনে যখন লিখেছিলেন হ্যামলেট কাব্যে :

There is a willow grows aslant a brook
That shows his hoar leaves in the glassy stream.

হঠাৎ এক মোড় ঘুরে চমকে' যেতে হয়,—সামনে লাল ইঁটের জমকালো বাড়ি, শেক্‌সপীয়র মেমরিয়াল থিয়েটার। প্রতি বছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে শেক্‌সপীয়র ফেস্টিভাল,—নতুন রিপার্টয়ার অনুযায়ী শেক্‌সপীয়রীয় নাটক অভিনয় হয়। দেশদেশান্তর থেকে লোক আসে দেখতে। প্রেক্ষাঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু লণ্ডনের সাধারণ থিয়েটারের তুলনায় এর ভিতরে আরাম অনেক বেশী।

এই থিয়েটার কিন্তু স্ট্রাটফোর্ড-এর প্রধান আকর্ষণ নয়। শেক্‌সপীয়র-এর জীবন-কাহিনী আছে বইএ কিন্তু কেউ যদি শুধু চোখে দেখে জানতে চায় তো সে আসুক এ-শহরে। প্রথমে যাওয়া যাক হেনলি স্ট্রীটে এক দোতলা বাড়িতে। বেশ বড়সড় বাড়ি—দেখে মনে হয় পশমের ব্যবসাতে কবির বাবা রোজগার করতেন ভালই। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে দোতলায়—আগে এ-জায়গায় ছিল মই আর মেঝে-কাটা

দরজা। দোতলায় উঠেই প্রথম ঘরে সাজানো আছে অনেক স্মৃতিচিহ্ন; কাঁচের নিচে সযত্নে রক্ষিত ফার্স্ট ফোলিও —১৬২৩ সালের। অদ্ভুত বানান, কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাল গেট-আপ। ডেস্ক আছে একটা, সেটা নাকি ছাত্রাবস্থায় কবি ব্যবহার করতেন স্থানীয় স্কুলে। পাশের ঘরটা রাস্তার উপরে, সেখানে কবির জন্ম। এ-বাড়িতে পদধূলি দিয়েছিলেন এমন বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে এখানে। জানলার কাঁচ চিরে নাম লিখেছেন এলেন টেরি এবং তার অভিনেতা-স্বামী হেনরি আর্ভিং, কার্লাইল, ওআল্টার স্কট ইত্যাদি। ছাদের গাএ পেন্সিলে লিখেছিলেন ডিকেন্স, ব্রাউনিং ইত্যাদি, কিন্তু চুন খসে' যাওয়ার ফলে কিছুদিন আগে এগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

শেক্‌সপীয়র পড়াশুনো করেছিলেন স্থানীয় এক গ্রামার-স্কুলে। সেই পুরনো বাড়িতে আজো কিন্তু স্কুল বসে। এর কাছেই কবির নিজের বাড়ি। ষাট পাউণ্ড দিয়ে পাশাপাশি দু'খানা বাড়ি কিনেছিলেন তিনি। এর একটি এখন নিউ প্লেস মিউজিয়াম। এখানেও আছে নানা রকমের বহু স্মৃতি-চিহ্ন এবং সেকালের অনেক শিল্পীর ও সাহিত্যিকের ছবি। পাশের বাড়িতে কবি বাস করতেন। সেখানে লিখেছিলেন অনেক অমর নাটক এবং সর্বশেষ 'টেম্পেস্ট্'। এ-বাড়ির ভিতটুকু ছাড়া এখন আর কিছু নেই। পরে যার দখলে

এসেছিল সে-ভদ্রলোক বাড়িটা ভেঙে ফেলেন। শেক্‌সপীয়র-স্মৃতি-উপাসক আগন্তুকদের ক্রমাগত আসা যাওয়ায় তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন—তার সাংঘাতিক ধ্বংশ-প্রবৃত্তির এটা অন্যতম কারণ। ওঠোনে আছে এক ইচ্ছা-কূপ, তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে' যা ইচ্ছা করা যাবে তা না-ফলে' উপায় নেই। পিছন দিকে সুন্দর ফুল বাগান।

এখান থেকে দেড় মাইল দূরে এক গ্রাম, সেই খঞ্জনা-গ্রামের নামটি শটারি। এখানে বাস করতেন অ্যান হ্যাথাওএ—কবি-প্রিয়া। জায়গাটা এখনো গ্রাম্য এবং তার মধ্যে হ্যাথাওএ-কুটির অতি সুন্দর মাধুর্যমাখা দৃশ্য। খড়ের চাল; কাঠ, গাছের ডাল আর মাটি দিয়ে তৈরি দেয়াল। চতুর্দিকে ছায়া-ঘন স্তব্ধ গাছপালার মধ্যে কটেজটি ছবির মত স্বপ্নময়। মাঠ ঘাট ভেঙে কবি এখানে রোজ আসতেন প্রিয়ার টানে। হ্যাথাওএ-বংশধরেরা ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাস করেছিলেন এ-বাড়িতে। সেকালে এটা ছিল প্রধানত গোলা-ঘর বা ফার্ম হাউস। অ্যান-এর বাবার অবস্থাও ভাল ছিল বোঝা যায় কারণ সেকালের অনুপাতে বাড়িতে জায়গা এবং সাজ-সরঞ্জাম অনেক। প্রথমে ডাইনিং রুম; এ-ঘরটাই সবচেয়ে বড় এবং এখানেই ওদের বেশী সময় কাটতো। প্রকাণ্ড চুল্লী বা ফায়ার প্লেস-এর এক পাশে সরু এক বেঞ্চি। এখানে আগুনের উষ্ণ আওতায় কবি বসতেন প্রিয়াকে পাশে

নিয়ে পূর্বরাগের সাধনায়, আর অ্যান-এর বাপ-মা বসতেন মুখোমুখি। একটা কাঠের টেবিল আছে তার একপিঠ রুক্ষ, অন্যপিঠ মসৃণ,—খাবার জন্য ব্যবহার হত একদিক, খাওয়া শেষ হলে উল্টে নে'য়া হত। খাবার থালাও কাঠের, তারও উল্টো সোজা বলা কঠিন; সূপ-এর জন্য এক পিঠ, মিষ্টির জন্য অন্য।

সরু কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমে অ্যান-এর বাপ-মা'র ঘর। ঘরে একটা জোড়া-খাট—অত্যন্ত নিচু এবং পুরনো কালের কারুকার্য করা। একটি কাঠের সিন্ধুক আর বিছানার পাএর কাছে ছোট এক বাক্স, তাতে থাকতো বাইবেল। এছাড়া আর কিছু নেই ঘরে। দেখে মনে পড়ে আমাদের সেকালের ঠাকুমা ঠাকুর্দার ঘর। এর পাশে এক ছোট্ট ঘরে থাকতো অ্যান।

শেক্‌সপীয়র-এর নিজের বাড়ির কাছেই হোলি ট্রিনিটি চার্চ। সংলগ্ন কবর-খানায় যাবতীয় অপাঙ্‌ক্তেয় লোকের সমাধি, কিন্তু কবি সপরিবারে আছেন গির্জার মধ্যে (স্ত্রী, বড় মেয়ে ও তার স্বামী, নাতনী-জামাই পর্যন্ত)। পুরনোরা নতুনকে চিরকাল জায়গা ছেড়ে দেয় সেই নিয়মানুসারে কবর-খানার প্রাচীন কঙ্কাল মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলা হয় নবাগতের দেহরক্ষার জন্য। কিন্তু কবির বেলায় তা হতে পারে নি। তার সমাধির সম্মানহানি যে করবে তার উদ্দেশ্যে

এক ভীষণ অভিশাপ ছন্দে গেঁথে রেখে গেছেন তিনি, সমাধির উপর স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে সেই মারণ-মন্ত্র। অথচ বিরাট প্রতিভার দেহাবশেষ দেখবার কৌতূহল দুর্দম; বিজ্ঞানের ছাত্ররা নিতে চায় মাথার খুলির মাপ। গোপনে কারা একবার চেষ্টাও করেছিল কবর ভাঙবার, কিন্তু সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কার মাথার থেকে হঠাৎ বেরলো এক আশ্চর্য বুদ্ধি: অভিশাপে আছে he, সুতরাং she-দের গাএ লাগতে পারে না কোনো অনিষ্ট। কিন্তু বড় বুকের পাটা নিয়ে আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসে নি কোনো মেয়ে। কৌতূহল মেয়েদেরই দুর্বলতা বটে, কিন্তু সংস্কার-ভীতিও তো তা-ই। সুতরাং কথা-শিল্পী কথার মারে নিজের ঘুমটি আজো রেখেছেন অক্ষুণ্ণ।

আমার বন্ধু লরেন্স-রা সেদিন দুপুরে খেতে ডেকেছিল আমাকে। একদা এক দেশী রেস্তরাঁতে ভারতীয় খাবারের প্রতি ওদের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করেছিলাম। খেয়ে তো খুব খুশী, যদিও পরদিন ভোর না হতে দু'জনকেই দৌড়োতে হয়েছিল স্থান বিশেষে। তাতে নাকি কিছু এসে যায় না,—ওরা আবার খাবে পরোটা আর ছোলার ডাল, চাপাটি আর কোপ্তা-কারি, জিলিপি এবং মোহনভোগ।

ইতিমধ্যে আমাকে একদিন 'প্রতিদান' দে'য়া দরকার। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের দেশে খাওয়াবো বললেই খাওয়ানো যায় না। রেশন নিতান্তই অকুলান। চতুর গৃহিনীরা এরই মধ্যে অবশ্য সামাজিকতা রক্ষা করে' চলেন,—অনেকদিন ধরে' একটু একটু করে' এটা সেটা জমিয়ে যোগাড় হয়

একজন অতিথির রসদ। তখন তার ডাক পড়ে খাবার টেবিলে।

লণ্ডন শহরের বহিরাংশে এক পরিষ্কার নিস্তব্ধ পাড়ায় ইভা ও রবার্ট লরেন্স-এর বাড়ি। বাড়িটি সুন্দর কিন্তু ছোট —যদিও তাতে ওদের কিছু এসে যায় না। ওদের সংসার এই দু'জনকে নিয়ে। প্রায় দশ বছর হল বিয়ে হয়েছে। আজো ইভা তার চাকরিটা ছাড়ে নি। অক্সফোর্ড স্ট্রীটে এক বিরাট ডিপার্টমেণ্ট স্টোর-এ কাজ করে সে। রবার্ট এক এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে নক্সা আঁকে। দু'জনের সম্মিলিত উপার্জনে বেশ স্বচ্ছলভাবে চলে ওদের ছোট সংসার। বাড়ি এবং আসবাবপত্র এখন ওদের নিজের— মাসিক কিস্তিতে টাকা দিয়ে কেনা।

বাড়ি সম্বন্ধে গর্ব ওদের স্বাভাবিক। সুতরাং আমাকে সব কিছু দেখাবার জন্য ব্যস্ত হল ইভা। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সরু জায়গাটুকুর শেষের দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। তার পাশে টুপি স্কার্ফ এবং ম্যাক বা ওভারকোট রাখবার জায়গা। নিচের তলায় রাস্তার দিকের ঘরটা বসার ঘর। পিছনের ঘরদু'টি খাবার এবং রান্নার। এই রান্নাঘরটি বড় ভাল লাগলো,—ছোট্ট কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কালি তো দূরের কথা, কোথাও একটু ধুলোর চিহ্ন নেই। ধাতুর জিনিসগুলি সব চকচক করছে। রান্নার জন্য উপুর হয়ে

বসে' কোমর ব্যথা করতে হয় না, বাসন মাজতে ঘাঁটতে হয় না ছাই-কাদা। এই ঘরটা ইভা-র সবচেয়ে গর্বের জিনিস। রান্নার কাজটা তাকে করতে হয়, এবং তারই ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী অনেক শ্রমহারী কলকব্জা এখানে বসিয়ে দিয়েছে রবার্ট তার এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি খাটিয়ে। উপরের তলায় দু'টি শোবার ঘর এবং একটি ছোট ঘর যাতে সাধারণত বাক্স তোরঙ্গ রাখা থাকে কিন্তু অতিথি এলে তার জন্য একটা বিছানা করে' দে'য়া চলে।

একটি একটি করে' অনেক জিনিসের ইতিহাস শুনতে হল। জানলার পর্দার কাপড় সে-বছর বেলজিয়াম-এ কেমন সস্তা দরে কিনেছিল এবং তার সঙ্গে অনেকখানি সুবিখ্যাত ব্রাসেল্‌স লেস,—আজো পাড়া-পড়শীরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। বসার ঘরের কার্পেটটার রং ছিল ফ্যাকাশে, তারপর বাড়িতে রং করে' নিয়ে এখন কেমন সুন্দর মানিয়েছে ঘরের সঙ্গে। ঐ যে প্যান-এর মূর্তিটা ম্যান্ট্‌লপীস-এর উপরে ওটা নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছিল বিয়ের সময়ে এক বন্ধু,—আর সে-ই এঁকেছে বব-এর ঐ ছবিটা; তখনকার দিনে বব ঐ রকমই দেখতে ছিল—বড্ড ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে, না? আর ঐ ছোট্ট রেডিও সেটটি বানিয়েছে বব নিজে, বলে' উজ্জ্বল চোখে তাকায় ইভা।

বব দেখালে তার বইএর আলমারি, তারপর নিয়ে গেল

বাড়ির পিছন দিকে। সেখানে ছোট্ট একটুখানি জমি। (ইভা বলে, 'আসছে বছর চাকরি ছেড়ে দেব, তখন ধীরে-সুস্থে বাগান করবো এখানে।' বব বলে, 'ইভা-র প্রতি-বছর ঐ এক কথা।') সেটা পেরিয়ে চৌকোণ এক কাঠের ঘর। এটা ওর ওআর্ক-শপ—এখানে সে মূর্তি দিতে চেষ্টা করে নানারকম খেয়ালী পরিকল্পনার। এখানে বানিয়েছে রেডিও সেট, এনলার্জার, টেবিল ল্যাম্প, আরো কত কী! ইভা-র কাছে রান্নাঘর যা, বব-এর কাছে এ-জায়গাটা তাই।

প্রতিবছর বসন্ত সমাগমে ইভা নিজের হাতে বাড়ির সর্বত্র আগাগোড়া পরিষ্কার করে; ডেকে আনে ডেকরেটার্স-দের —ঘর দোরে নতুন রং লাগিয়ে সংস্কার করে' দিয়ে যায় তারা।

খাবার সময় হল। এদেশের এমন দিনকাল যে প্রতিদিন তিন কোর্স অনেকেই খায় না। কিন্তু আজ অতিথি এসেছে, সুতরাং প্রথমে এল গরম টোমাটো-সূপ; এক রোল্ রুটিও পাওয়া গেল। সূপ শেষ হতে ইভা উঠে যেয়ে উনুন থেকে বা'র করে' নিয়ে এল রোস্ট্ বীফ্। নাতি-বৃহৎ ঐ টুকরোটি ওদের এক সপ্তাহের বরাদ্দ। ওরই থেকে কেটে কেটে খেয়ে আবার রেখে দে'য়া হবে। কাটবার ভার পড়লো বব-এর উপর। তার হাত নাকি এ-ব্যাপারে খুব ওস্তাদ; অর্থাৎ, খুব সূক্ষ্ম ফালি কাটার শিল্পটা সে আয়ত্ত করেছে। হোটেল রেস্তরাঁতে চাকরি নিলে এ-দুর্দিনে ওর নিশ্চয় আদর হত খুব।

সবচেয়ে নরম এবং সুস্বাদু (ইভার মতে) অংশের থেকে কাটা স্বচ্ছপ্রায় এক ফালি মাংস পড়লো আমার পাতে। এর সঙ্গে অবশ্য আছে অনিবার্য ইয়র্কশায়ার পুডিং এবং বাঁধাকপি সিদ্ধ। তবে আলুগুলি সিদ্ধ নয়, ঝলসানো—সম্ভবত অতিথির খাতিরে। সবসুদ্ধু পুরোদস্তুর ইংরেজী খানা—যেন ইউনিয়ন জ্যাক-এর মার্কা মারা। আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি রোস্ট্ বীফ-এর সঙ্গে কেন খেতেই হবে ইয়র্কশায়ার পুডিং অথবা ল্যাম-এর সঙ্গে মিণ্ট্ সস্। কিন্তু সে অন্য কথা।

ওটা শেষ হলে আরেক টুকরো মাংসের জন্য দু'চারবার সাধাসাধি করে' ইভা উঠে যেয়ে নিয়ে এল মিষ্টান্নটি। আজকের টেবিলে এটাই তার সবচেয়ে গর্বের উপকরণ—ক্রিস্‌মাস পুডিং। এরই জন্য সে সযত্নে জমিয়েছে চিনি, কিসমিস, বাদাম, আরো কত শুকনো ফল; রান্নার সময়ে বারে বারে দেখেছে রংটা ঠিক যথেষ্ট কালো হয়েছে কিনা। সযত্নে খণ্ডিত করে' পরিবেশন করলে ইভা। এক টুকরো মুখে দিয়েই তারিফ করলাম ওর কৃতিত্বের। হঠাৎ ঠন্ করে' শব্দ প্লেটে, দেখি ছোট্ট সাদা একটি রজতমুদ্রা—অধুনা-অপ্রচলিত ত্রি-পেনি। 'ক্রিস্‌মাস পুডিং-এ পয়সা দে'য়া আমাদের রীতি, ওটা তুমি নিয়ে নাও,' ইভা বললে; 'আর, এর পরে কফি খাবে না চা?'

বললাম, 'চা খাব,—এখানে নয়, বসার ঘরে।'

'আমি জলটা চড়িয়ে দিয়ে আসি,' বলে' বব উঠে গেল রান্নাঘরে।

অতি সামান্য এবং সাধারণ খাওয়া। গরিব ভারতবর্ষের লোকে শুনলে বিশ্বাস করতে চায় না যে এত কম খেয়ে বেঁচে থাকা যায় সুস্থ দেহে। এরাও হয়তো বিশ্বাস করতো না যুদ্ধের আগে। অনেক বড় বড় জৈব-রাসায়নিক অবাক হয়েছেন—এত কম খেয়েও মানুষ চলে! দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে শুধু অবস্থাপন্নরাই নয়, মধ্যবিত্তরাও প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত খায়। কিন্তু আমরা পরিমাণে যতগুণ বেশী খাই, পুষ্টিতে ততটা নয়। সুতরাং খাওয়ার পরে গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে দু'দণ্ড, বুকের চেয়ে পেটের পরিধি বাড়ে দ্রুত। আমাদের মসলা-চর্চরিত রান্না সুস্বাদু সন্দেহ নেই, কিন্তু আয়ুর দৈর্ঘ্য বাড়ায় না,—পেটে আনে বেদনা, বুকে ধরায় জ্বালা। এদের আটপৌরে সিদ্ধপ্রধান পাকে সিদ্ধহস্ত হওয়া যেমন সহজ, পাকস্থলীরও বেগ পেতে হয় না ব্যঞ্জনকে বাগে আনতে। অবশ্য, 'খেয়ে নাও দু'দিন বই তো নয়' এই মতবাদের আবেদনও উপেক্ষণীয় নয়।

ইংরেজ জাতির রান্নার আনাড়ীপনা জগত-কুখ্যাত। এটা বাড়ন্ত সেটা বাড়ন্ত জানি, কিন্তু এরই মধ্যে ফরাসীরা বা ইটালিয়ানরা কিংবা আমাদের ওদিকে চিনেরা বা ভারতীয়রা

অনেক মুখরোচক খাদ্য পরিবেশন করতে পারে,। এরা নিজেরাও তা মানে।

প্রয়োজনের উপযুক্ত খাবার নেই কিন্তু তাবলে অনুষ্ঠানের হানি নেই আজ পর্যন্ত। খাদ্যে স্বাদ নেই হয়তো, কিন্তু আয়োজন ছিল চিরকালই। রান্নার পিছনে যতটা সময় এবং যত্ন যায় তার চেয়ে বেশী যায় অনেক সময়ে তারই সাজ-সজ্জায়। ড্রেসিং-এর আড়ালে মাংসের টুকরোটা হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু সবসুদ্ধু দেখতে এত সুন্দর যে ছুরি ছোঁয়াতে মায়া হয়। কেক-এর উপরে আইসিং-এর নক্সাটার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে যদিও কেকটা খেতে লাগবে অনেকটা করাতের গুঁড়োর মত। সালাড-এর সবজিগুলি এত একঘেয়ে যে জিভে ঠেকাতে ইচ্ছে করে না কিন্তু বীট, গাজর, আলু, লেটিস সাজাবার ধরণ এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য চোখে লাগে ভাল; ওর মধ্যে হয়তো আছে মাত্র এক ফালি অতি-স্বচ্ছ শশা—এত পাতলা যে স্বাদ পাওয়া যাবে না,—কিন্তু দুষ্প্রাপ্যতার দৌলতে থালার মধ্যে মুকুটের মত বিরাজ করছে।

য়োরোপীয়দের এই পরিবেশনের আয়োজন ভাল লাগে তার কারণ, প্রধানত, খাওয়া ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত স্থূল,—তার গাএ সুন্দর এবং সূক্ষ্ম পোশাক পরাবার চেষ্টা সভ্যতার চিহ্ন। প্রকাণ্ড হাঁ করে' অনেকখানি একসঙ্গে মুখে ঢুকিয়ে

নানারকম শব্দ এবং মুখবিকৃতির সঙ্গে সেটাকে পেটে পুরে সগর্জনে ঢেকুর তোলার মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পায়, এরা মনে করে। সেজন্য ছোট ছোট টুকরো নেয় মুখে, মুখ বন্ধ করে' নিঃশব্দে চিবোয় এবং পরে উদ্গার-গর্জনে তৃপ্তি প্রকাশ করে না। গলাধঃকরণটা যেন সমস্ত আয়োজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গৌণ অংশ এই ভানকে সাহায্য করে এদের আরো অন্যান্য রীতি; যথা, টেবিলে বসে' বাক্যালাপ করতে হবে সোৎসাহে, অথবা খাবার জন্য বিশেষ পোশাক পরতে হবে। আমাদের তুলনায় আহারের চেয়ে পানের আপেক্ষিক গুরুত্বও যেন আহারের স্থূলতাকে করে মৃদু। দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে' আজকের ইংলণ্ডে এত অভাব অনটনের মধ্যেও এরা যে যথাসম্ভব ঠাট বজায় রেখে যাচ্ছে এতে প্রমাণ হয় এই আয়োজনপ্রিয়তা ঢুকেছে এদের অভ্যাসের মধ্যে, এবং তাছাড়া, দুর্ভাগ্যের কাছে এরা হার মানছে না। এই চেষ্টার মধ্যে কেমন একটা হৃদয়স্পর্শী কারুণ্য আছে! একবার আমার এক ল্যাণ্ডলেডি সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি ঢুকতেই আমাকে উৎফুল্ল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানালেন সে আজ ডিনার-এ এক নতুন জিনিস খাবো আমরা—আঙুর। বহুদিন এই সব হারানোর দেশে কাটাবার পর ওকথা শুনে যে একটু আনন্দ হল না তা বলতে পারি না। কিন্তু ওমা—অবশেষে প্রকাণ্ড থালার মধ্যিখানে এল সযত্ন-ধৌত চকচকে তিনটে ছোট ছোট

আঙুর। ওদের ঐ মসৃণ রসালো কমনীয়তা লোভ জন্মাবার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু লোভ উপশমের পক্ষে সংখ্যায় তারা নিতান্তই অকুলান। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে একেই মানতে হবে এক সম্পূর্ণ কোর্স বলে'। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের থেকে চোখ তুলে দেখি গর্বে আনন্দে গৃহকর্ত্রীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম তাকে। এর বদলে সেমলিনা পুডিং পেলে হয়তো পেট ভরতো বেশী, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে আকাশ-যানে সেলোফেন-মণ্ডিত হয়ে এসেছে এ-আঙুর। সুতরাং তার দাম কম নয়।

আগেকার দিনে এদের অভাব ছিল না কিছুরই। দেশে জন্মায় ক'টাই বা জিনিস, কিন্তু ছিল সাম্রাজ্য, ছিল ডলার, ছিল জাহাজ। এখন এসবের কোনোটাই নেই যথেষ্ট পরিমাণে। এসেছে দুঃখের দিন। কিন্তু দুঃখ হয়তো আরো বেশী হতে পারতো। অভাবের অনু-পাতে যেটুকু দাম বেড়েছে জিনিসপত্রের, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। কালোবাজার যা আছে তা অন্ধকারেই থাকে, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে বিচরণ করে না। ষাট-সত্তর টাকায় হয় মোটা পশমী স্যুট, সস্তার দিনে আলুর সের এখনো দু'তিন আনা। দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস সস্তা থাকায় গরিব লোকের কষ্ট বাড়ে নি

বেশী। কিনতে না-পারাটা অনেক ক্ষেত্রেই পয়সার অভাবে নয়—বাজারে মালের অভাবে।

এটা হয়েছে শুধু য়োরোপীয় সভ্যতার বা জাতীয় চরিত্রের গুণে নয়, য়োরোপের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। প্যারিসের রেস্তরাঁতে পেট ভরে' খেতে গেলে খরচ হয় দশ পনেরো টাকা। ইটালিতে সরকারী হারে কেউ পাউণ্ড ভাঙায় না—ন'শো লিরা-র জায়গায় তু'হাজার (সম্প্রতি আরো বেশী) পাওয়া যায় অনায়াসে, পুলিসের চোখের সামনে। এসব দেশের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম। জার্মানদের মত নিয়মানুবর্তী সভ্য জাত নাকি সারা জগতে আর ছিল না,—আজ সেখানে কালোবাজারই একমাত্র বাজার। পেটের দায়ে সব হয়, সব রকম লোভ প্রশ্রয় পায়। ইংলণ্ডে সে-অবস্থা আসে নি সেটা ইংরেজ-চরিত্রের বিশেষ কোনো গুণে নয়, পেটের দায় প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি এই কারণে। সুতরাং এ-সূত্রে কৃতিত্ব প্রধানত গভর্মেণ্টের। বাঁধা-দর জিনিসের কথা ছেড়েই দাও, রেশন-বহির্ভূত তরি-তরকারি ইত্যাদির দাম তু'এক পেনি বাড়লে পার্লামেণ্ট-এ প্রশ্ন ওঠে।

সে যাক, বলছিলাম এদের প্রাত্যহিক জীবনে আয়োজন এবং অনুষ্ঠানের কথা। শুধু খাবার টেবিলেই নয়, পোশাক পরিচ্ছদে এবং নানাবিধ ঘরোয়া ব্যাপারে এটা

লক্ষণীয়। ঘরের বিভিন্ন জিনিসগুলির রং আলাদা রকম আলাদা,—তার মধ্যে কী করে' সঙ্গতি আনা যায় তার পিছনে মাথা ঘামাবে এরা। অনেক আপাততুচ্ছ খুঁটি-নাটির প্রতি যে-যত্ন এবং মনোযোগ প্রয়োগ করবে তা আমাদের কাছে মনে হবে অপব্যয়। বাজার করতে আমরা যাই ময়লা চটের থলে নিয়ে, বাড়ি এসে ছুঁড়ে ফেলি ওঠোনের কোণে। এদের থলেটা অনেক বিবেচনা করে' কেনা অথবা তৈরি, তার নক্সাটা দেখতে সুন্দর, সুতরাং ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকারে কোনো লজ্জা নেই তার। কাউকে কিছু উপহার পাঠাতে হলে আমরা সেটাকে মুড়ি খবর-কাগজে—বড়জোর বালি-কাগজে; ঐ কাজের জন্য এদের আছে নক্সা-আঁকা সুদৃশ্য কাগজ। এটা না-হলেও চলে, এর জন্য পয়সা খরচ হয়, কিন্তু উপহার দে'য়াটাও খরচের ব্যাপার। হয়তো এক পাউণ্ড-এর সঙ্গে ছ'পেনি যোগ হল কিন্তু জিনিসটা যে পেল পাওয়ার মুহূর্তে তার আনন্দের সঙ্গেও যোগ করা হল কিছু। তারপর ধর ফুল। ফুল কেনা এদের আরেকটা 'অপব্যয়ী' বাতিক। ফুলের দামও সাংঘাতিক। কিন্তু অনেকে আছে যারা বাজারে যেয়ে পাঁচ শিলিং-এর খাবারের সঙ্গে কিনবে পাঁচ শিলিং-এর ড্যাফোডিল। খাবার টেবিলে ড্যাফোডিল নিশ্চয় না-হলেও

চলে, কিন্তু অপব্যয়ী বদ্‌খেয়াল যদি করতেই হয় তো সৌন্দর্য-প্রিয়তার নেশাই ভাল। তাছাড়া, বাইবেলে বলেছে :- বাঁচবার জন্য মানুষের শুধু রুটি হলেই চলে না।

য়োরোপীয় পোশাক পরিচ্ছদের সৌখিনতার প্রতি ভ্রূকুঞ্চন করি আমরা। অনেকে বলে ওদের পয়সা আছে, ফ্যাশান-দুরস্ত হওয়া সাজে। ধনীরা অবশ্য দামী জামা পরে, কিন্তু গরিবদের আটপৌরে পোশাকেও রুচি এবং সঙ্গতির প্রতি যত্ন লক্ষ করা যায়। জামা বানাবার সময়ে অনেক রকম বোতাম থেকে হয়তো একটা খুঁজে বা'র করবে যেটা মানায় সেই বিশেষ পোশাকে, কিংবা হয়তো পকেটের মুখটা টেরচা করে' কেটে আনবে একটা নতুনত্বের ছাপ। অর্থাৎ, জামা শুধু লজ্জা এবং শীত নিবারণের জন্যই নয়। ফ্যাশান-দুরস্ত পোশাক অনেকের চোখে লঘু মনের পরিচায়ক, কিন্তু আসলে ওতে মানুষ-মনের সৌন্দর্য-প্রীতিরই বিকাশ। প্রস্তর যুগে মানুষ শীত নিবৃত্তি করেছে গাছের ছাল বা পশুর চামড়া জড়িয়ে। কিন্তু যে-প্রবৃত্তির বশে সে গুহার দেয়ালে ছবি এঁকেছে, সেই প্রবৃত্তিই তাকে টেনেছে পোশাকের সংস্কৃতির দিকে। সেই আদিম প্রবৃত্তির খেলা চলে আজো বছরে বছরে ঋতুতে ঋতুতে, প্যারিসকে কেন্দ্র করে'। তাই সেখান থেকে যখন এদেশে এল 'নবরূপ' (New Look) তখন কেউ তাকে রুখতে

পারলে না, যদিও তার বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল কঠিন। কৃচ্ছ্রব্রতী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স বললেন, এতে কাপড় অনেক বেশী লাগবে, এদিকে আমাদের বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ, কুপন-সংকট। কিন্তু 'নবরূপ'-এর ঢেউ গ্রাস করলে লণ্ডন-ললনাদেরও জামার নিচে হাঁটু দেখা যাওয়া সৌখিন সমাজে তাই আজকাল লজ্জাকর সেকেলে ব্যাপার।

সব ফ্যাশানই যে সুন্দর নয় সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য। অনেক স্থলে নতুনত্বের আকর্ষণটাই প্রধান, কোথাও বা দুর্মূল্যতার। নতুনত্বের আবেদন তুচ্ছ করবার নয়,—প্রকৃতির নিয়মে ঋতুতে ঋতুতে এ-জিনিসেরই বিকাশ। গোলাপ বা রজনীগন্ধা সুন্দর ফুল, কিন্তু সারা বছর ধরে' ফুটলে ভাল লাগতো না এত। তেমনি মানুষ বদলায় পোশাকের ফ্যাশান। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্যাশানের মধ্যে না পাওয়া যায় সৌন্দর্যের ইঙ্গিত, না মেলে নতুনত্বের ঔজ্জ্বল্য। অনেক সৌখিন মহিলা কাঁধে বয়ে বেড়ান শেয়াল জাতীয় জানোয়ারের ছাল—লেজ নখ দাঁত সবসুদ্ধু সুসম্পূর্ণ—যা দেখে ছোট ছেলেদের ভয় পাওয়া বিচিত্র নয়। এখানেও বোধহয় দেখি এক আদিম প্রবৃত্তির খেলা, যে প্রবৃত্তির বশে প্রস্তর যুগের মানুষ ধাওয়া করতো বন্য পশুকে লক্ষ করে'।

এদের কথাবার্তার ফ্যাশানও আমাদের থেকে অন্যরকম,

দুরস্ত হতে সময় লাগে প্রাচ্য দেশের লোকদের। 'সুপ্রভাত', 'সুসন্ধ্যা', 'আজ দিনটা কী চমৎকার', 'কী বিশ্রী আবহাওয়া', এসব তো লেগেই আছে, তাছাড়া আছে কথায় কথায় ধন্যবাদ। অনেক সময়ে ধন্যবাদটা এত আপাত-অর্থহীন বা এত সামান্য কারণে যে ভাবতে বেশ মজা লাগে! বাস-কণ্ডাক্টার পয়সা না-চেয়ে বলবে 'ধন্যবাদ', ভাড়ার প্রত্যাশায়—এবং হয়তো পয়সা হাতে পেয়েও মন্ত্রটা উচ্চারণ করবে আবার। রেস্তরাঁর পরিবেশিকা সামনে খাবারের থালা রেখে বলবে 'ধন্যবাদ',—সেটাও প্রত্যাশায় অর্থাৎ তুমি যে তাকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছ তার উত্তর। কথিত আছে, এদেশে কয়েক বছর বাস করার পর এক বাঙালী ছেলে কলকাতায় ফিরে রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে কলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেলেছিল।

এখানে এসে প্রথম প্রথম এদের ভদ্রতার আতিশয্যে মাঝে মাঝে চমকে যেতে হয়। একবার এক রেস্তরাঁয় খাচ্ছি এক ইংরেজের মুখোমুখি বসে'। হঠাৎ অন্যত্র এক বন্ধুর দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে উঠে গেল তার টেবিলে, কিন্তু যাবার আগে আমার অনুমতি চাইলে সবিনয়ে, যদিও এপর্যন্ত তার সঙ্গে আমার মোটেও বাক্য-বিনিময় হয় নি। ট্রেনের কামরায় একা বসে' আছি, নতুন এক যাত্রী উঠে দুঃখ প্রকাশ করলে ভীড় বাড়াবার জন্য, এমনও হয়েছে।

এগুলি অবশ্য এদের অনেকের কাছেও বাড়াবাড়ি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ধন্যবাদ এবং সাধারণ ভদ্রতা সম্বন্ধে আমরা বড় কৃপণ। আমরা ট্রামে-বাসে অন্যের হাত থেকে বিনা-বাক্যব্যয়ে খবর-কাগজ টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করি। সমর্থ স্বাস্থ্যবতী কোনো মেয়ের পাএর ধুলো পড়লে বুড়ো ভদ্রলোক যখন ট্রামের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান তখন দেবীর মুখে কৃতজ্ঞতা বা বিনয়ের কোনো কথা দূরে থাক, রেখামাত্র ফোটে না, পাশে জায়গা খালি থাকলেও বসতে বলেন না বুড়োকে। প্রসঙ্গত বলে' রাখি, জায়গা না থাকলে এদেশে মেয়েরাও দাঁড়িয়ে থাকে,—তারা মানে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দায়িত্ব কষ্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; এবং শিভালরি দাবির জিনিস নয়, বিনয়ের সঙ্গে মাথা নামিয়ে গ্রহণ করতে হয়।

আমরা বলে' থাকি, কৃতজ্ঞতা আমরা বাক্যাড়ম্বরে জানাই না বটে, কিন্তু সেটা আছে আমাদের মনে। তা যদি সত্যি হয় তবে অনেক সময়ে আমরা মনের আবেগ এমন আশ্চর্য-ভাবে গোপন করে' থাকি যে আমাদের আত্ম-সংযম জগতের আর সব জাতকে হার মানাবে। তাছাড়া, মুখের কথারও উপকারিতা আছে। যেখানে মনে হবে কথা বাহুল্য, ভদ্রতা অত্যধিক, সেখানেও অপরের সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগা-যোগে ভদ্রতা-বাক্যে দু'পক্ষেরই কাজ আদায় হয় বেশী,

মেজাজও থাকে ভাল। এদের আচার ব্যবহারে পারস্পরিক ভদ্রতা-প্রতিযোগিতা সেই কারণে শুধুমাত্র সংস্কৃতির চিহ্নই নয়, বাস্তবিক সুবিধাজনক।

ইংরেজদের কথার ভাষা অনেক সময়ে এত প্রলম্বিত বা জড়িত যে পাঠোদ্ধার দুরূহ। তাছাড়া, মনের ভাবের উপযোগী শব্দের পরিবর্তে অত্যন্ত মৃদু বা অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার—অর্থাৎ euphemism—এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। যেখানে মন বলছে: তোমার ও-কথা আমি মানি না, সেখানে মুখ বলে: এ-বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমি তোমার মত অতটা সুনিশ্চিত নই। মন বলবে, 'খারাপ', তো মুখ বলবে, 'খুব ভাল নয়'—not too good।

ভাষায় আড়ম্বরপ্রিয়তার এই বিকৃতির সঙ্গে বোধহয় red tape বস্তুটির যোগ আছে। অনেকদিন ধরে' ইংরেজের শিক্ষকতার ফলে ঐ-শিল্পে আজ আমরা কতদূর পারদর্শী হয়েছি তা যারা হয়তো পাস-পোর্ট করবার চেষ্টা করেছেন, এমনকি যারা পোস্টাপিশে টাকা তুলতে গেছেন তারা ভাল রকমই জানেন। এসব ক্ষেত্রে নিজের দেশে ইংরেজের তৎপরতায় তাই আশ্চর্য হতে হয়। অনাবশ্যক নিয়ম-কানুন বাদ দে'য়ার ফলে কাজ কর্ম সাধারণত চলে মসৃণ দ্রুত গতিতে, কাজ আদায় হয় সহজে। এখানে ব্যাংক পাস-বই দেয় না, কিন্তু এক মিনিটে জানা যায় টাকা-কড়ির হিসেব; ব্যাংকের

কেরানী টাকা জমা নিয়ে রসিদ দেয় না, কিন্তু কিছু গোলমাল হয় না এতে। রেজিস্ট্রি ডাকের পার্সেলে আষ্টেপৃষ্ঠে গালা এঁটেও পোস্টাপিশের কেরানীবাবুর মনঃপূত হয়নি বলে' বাড়ি ফিরে আসতে হয় না।

কফি খাওয়া হতে ইভা বললে, 'আমায় এবার একটু মাপ কর, বাসন ধোয়াটা সেরে আসি।' বললাম, 'আমি সাহায্য করতে পারি কি?' বব হেসে বললে, 'তার দরকার হবে না, আমার মত একটা পুরুষসিংহ থাকতে। তুমি ততক্ষণ আমাদের এই আলবামটা দেখ, আর রেডিওটা খুলে দিচ্ছি, ভাল বাজনা আছে এখন।'

আলবাম-এ আছে ওদের দু'টি জীবনের অনেক ছবি, শৈশব থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্যন্ত অনেক দিনের। বসে' বসে' দেখতে বেশ লাগলো। একটু পরে ওরা এল,—অনেক ছবির ব্যাখ্যা করলে, টিপ্পনী কাটলে একে অন্যের প্রতি।

বব-এর বুঝি ছিল নক্সা আঁকার কাজ, সে গেল অন্য ঘরে। আলবাম বন্ধ করে' ইভাকে বললাম, 'তোমার বিয়ের গল্প বল শুনি। জগতে এত পুরুষের মধ্যে বব-কে কী করে' বেছে নিলে।'

বিয়ের গল্প বলতে কোন্ মেয়ে না চায়, বিশেষ করে'

ওর মত সুখী মেয়ে। সুখী হবে কিনা সে-সম্বন্ধে কিন্তু ওর মনে সন্দেহ ছিল বিয়ের সময়ে। সে-গল্পও বললে ইভা। একটি ছেলেকে তার ভাল লেগেছিল। বব-এর চেয়ে লম্বা, সুখদর্শন। মোটর সাইকেল ছিল তার এক, তার পিছনে ওকে চড়িয়ে হাওয়ার বেগে ছুটতো সে সবাইকে পিছনে ফেলে। পয়সা সব সময়ে থাকতো না পকেটে, কিন্তু নজরটা ছিল অভিজাত। ওকে যখন নিয়ে যেত অপেরায় থিয়েটারে নাইট-ক্লাবে, কিনতো সবচেয়ে দামী টিকিট। অবশেষে এক রবিবার বিকেলে ইভা বাড়িতে চাএর টেবিলে নিয়ে এল ওকে, পরিচয় করালো বাবা-মা'র সঙ্গে। কিন্তু বিয়েতে তারা আপত্তি করলেন। এ-ছেলের সবই ভাল, কিন্তু স্বামী হিসেবে সে নির্ভরযোগ্য নয়। বড় বেশী এলোমেলো, বড় বেহিসেবী খরচ করে। তার চেয়ে বব অনেক steady—সে সব সময়ে যত্ন করবে ইভা-কে, দায়িত্ব ভুলবে না কোনো, সংসারটা টিঁকবে সুরক্ষিত দুর্গের মত।

ইভা একাঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদলো। যে এসেছে পক্ষীরাজে চড়ে' হাওয়ায় উড়ে, চতুর্দিকে অকাতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তার প্রণয়ে উদ্বেল সাগরের উচ্ছ্বাস। আশ্চর্য তার মাদকতা!···কিন্তু সত্যিই কি ওর পক্ষীরাজ ঘোড়াকে ইভা বেঁধে রাখতে পারবে তার ঘরে, যে-ঘরের স্বপ্ন অগোচরে গড়ে' উঠেছে তার কুমারী-মনে! ভাবতে

ভাবতে ওর চোখের জল শুকালো। অবশেষে উত্তাল সমুদ্রকে ছেড়ে গেল সে স্থির দীঘির দিকে।

সে আজ অনেক দিনের কথা। দশ বছর! আজ সে জানে সে ভুল করে নি! সমুদ্রকে সে এখানে পায় নি—সে-জিনিস এখানে পাওয়া যায় না—কিন্তু তা নিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না।

সব মেয়ের মনেই এই ঘর বাঁধবার নেশা। সর্বদেশে সর্বকালে। যারা বলে পাশ্চাত্যের মেয়েরা খালি চায় মজা লুটতে, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে, তাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। এদেশে বাস করেও ওকথা বলে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। এরা অনেকে ইংরেজ-গৃহের ভিতরে ঢোকেন নি; অনেকে ঢুকেছেন, জেনেছেন, তবু মেকী স্বজাতিপ্রীতির বশে পরনিন্দা করে' থাকেন। খবর-কাগজে এদেশে গৃহত্যাগের খবর ডিভোর্স-এর খবর পাওয়া যায়, আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, তাতে যেন এ-ই প্রমাণ হয় যে আমাদের সব ঘরে সতীত্বের প্রতিমা রয়েছে নিষ্কলুষ, আমাদের সব সংসারে বিরাজ করছে অখণ্ড দাম্পত্য শান্তি, সুমধুর সম্প্রীতি! এদেশে যারা ঘর ছাড়ে হয়তো তাদের বুক ফাটে তো মুখও ফোটে, যারা ডিভোর্স কোর্ট-এ যায় তাদের ধারণায় ভালোবাসা হয়তো কর্তব্য বস্তুটার এক ক্ষুদ্র এবং গতানুগতিক অংশমাত্র নয়।

অধিকাংশ মেয়েই আমাদের ইভা-র মত। সুবিধেমত

একটি বর জুটিয়ে ঘর করতে চায় নির্ঝঞ্ঝাটে। বর জোটানো আজকাল বড়ই দুরূহ ব্যাপার, কারণ পুরুষের সংখ্যা গেছে কমে'। (সে-ব্যাপারটা এদের পথে ঘাটে সর্বদাই নজরে পড়ে।) এর জন্য যে-কষ্ট এবং ধৈর্য এদের প্রয়োজন হয় তা আমাদের দেশের বস্তি-মেয়ের বাপকেও হার মানাবে। তাও শেষপর্যন্ত ঈশ্বর মুখ তুলে চাইবেন কিনা কে জানে! বয়স বাইশ-তেইশ পেরিয়ে গেলেই ভয় ঢুকতে থাকে মনে—চিরকৌমার্যের ভয়। অনেক ভাল ভাল মেয়েরই ঘটে সেই ভয়ংকর দুর্দশা। যাদের কপাল ভাল, বাগ্‌দানের আংটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পরম উৎসাহে লেগে যায় ভাবী সংসারের প্রস্তুতিতে। সাধারণত এক বছর কি তারও বেশী বাগদত্তা থাকে এরা, তার মধ্যে পরস্পরকে জানে ভাল করে', ঘনিষ্ঠতার আওতায় একে অন্যকে বরদাস্ত করতে পারে কিনা তার পরখ হয়। আর চলে জল্পনা-কল্পনা। বাড়ি যোগাড় করা, আসবাবপত্র কেনা এবং এসবের জন্য পয়সা জমানো। পণপ্রথা নেই বটে কিন্তু অনেক সময়ে কন্যা সঙ্গে নিয়ে আসে নিজের উপার্জিত অর্থ। কেউ কেউ বিয়ের পরেও চাকরি করতে থাকে,—যেমন আমাদের ইভা। এদের দু'জনের কারো বাপের টাকা ছিল না। তবু আজ বেশ আরামে সুখে শান্তিতে আছে। নিজেদের চেষ্টায় অল্পে অল্পে কিনেছে বাড়ি, আসবাব।

এদেশেও পরিবারের প্রকৃত কর্ণধার পুরুষ, তবু স্ত্রীর মর্যাদা অনেক বেশী আমাদের তুলনায়। অধিকার অনেক বেশী প্রশস্ত, অবজ্ঞা সইবে না কোনো রকম। আদর্শ এদের স্বামী-সেবা ততটা নয়, যতটা যুগ্ম-জীবনের সমান অংশীদার হওয়া। এ-মর্যাদার উপযোগী যে-দায়িত্বজ্ঞান এবং ক্ষমতা প্রয়োজন তাও প্রায়ই দেখা যায় এ-মেয়েদের মধ্যে। সেজন্য, বিয়ের পর পুরুষের বোঝা অনেক সময়ে বাড়ে না, বরং হালকা হয়। একত্রে পথ-চলার গ্রন্থিটা বন্ধনহীন, মুক্ত।

পত্নীকে সাথী এবং সহচরীরূপে এখানে পুরুষ পায় কাজে এবং খেলায়, সাধনায় এবং উপভোগে। শুধু ঘরের কাজের মধ্যেই যে গৃহলক্ষ্মীর চরম সার্থকতা সে-আদর্শ এখানে নেই। অনেক ঘর আছে যেখানে সংসারের কাজের পর গৃহিণীর আর সময় থাকে না বাকি কিন্তু সেখানেও স্বামীর গতিবিধি এবং কার্যকলাপের সঙ্গে তার যোগ ঘনিষ্ঠ। ওসব খবরে ঘরের বৌর কোনো প্রয়োজন নেই এমন কথা স্বামীরাও ভাবে না। কোনো বন্ধু যদি বব-কে ডাকে এক সন্ধ্যায় সিনেমায় বা ডিনার-এ তবে বব কখনো আসবে না ইভা-কে না জানিয়ে। এ-মনোভাবে স্ত্রৈণতা প্রকাশ পায় না, যেমন পায় নি আজ যখন বব গেল ইভা-কে বাসন ধোয়ার কাজে সাহায্য করতে।

সাথিত্বের সবচেয়ে বড় জিনিস সম্পদ এবং বিপদ সমান-

ভাবে সহজভাবে গ্রহণ করা। সুখের দিনে উৎসবের সাথী হতে পারে যেমন এদের মেয়েরা আমাদের চেয়ে বেশী, তেমনি দুঃখের দিনে অসহায় ভার হয়ে ঝোলে না গলায়। 'ছেঁড়ে যদি পাল, ভাঙে যদি হাল', তবু ভাগ্যকে তুচ্ছ করতে পারে। আমাদের দেশের তথাকথিত 'পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন' যে-সব আধুনিকারা রুজ মেখে এবং ইংরেজি উচ্চারণে এদের অনুকরণ করেই নিজেদের ভাবেন এদের সমান সমান, তারা আসলে কতটুকু এগোতে পেরেছেন পাশ্চাত্য স্ত্রী-চরিত্রের প্রধান গুণ এই সাথী-রূপের দিকে!

এমন কথা বলতে চাচ্ছি না যে এদেশে সব মেয়েই সাথী, সব মেয়েই সতী। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে অধিকাংশের কথাই বলতে হয়। তাছাড়া, নীতির নিয়ম এদের আলাদা। আমাদের দেশে ছেলে মেয়ের রাস্তায় হাত ধরাধরি করে' চলা নীতিবিরুদ্ধ, সিনেমায় চুম্বন দেখানো দুর্নীতি। কিন্তু, সেক্স বস্তুটা অস্বাভাবিক কিছু নয়; সুতরাং সে-সম্বন্ধে অত্যধিক লুকোচুরি বা ওটা এক উল্লেখ-অযোগ্য অশ্লীলতা এমন ভাব দেখা যায় না এদের আচারে বা আলাপে। শুধু শৈশবে স্কুলেই নয়, বড় হলেও ছেলেরা মেয়েরা একসঙ্গে কলেজে পড়ে, তামাসা করে, খেলে,—নৈতিক অধঃপতন তাতে বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় না। বরং অস্বাভাবিক বাঁধন না-থাকায় মন বিকশিত হয় আরো মুক্ত এবং সহজ ভাবে।

সেক্স-এর দৈহিক দিকটা অতিরিক্ত ভারি হয়ে চেপে থাকে না মগ্ন-চেতনায়। আমাদের দেশে ছেলে মেয়েরা চোখ তুলে তাকাতে পারে না পরস্পরের দিকে। সেক্স সম্বন্ধে এই যে সদা-সচেতন লজ্জা, আমার মনে হয় এই জিনিসটা অনেক বেশী অশ্লীল এবং লজ্জাকর ব্যাপার পাশ্চাত্য মেয়েদের তথাকথিত 'বেহায়াপনা'র থেকে; কারণ ওতে প্রকাশ পায় এমন একটা জিনিসের হীনতার স্বীকৃতি যে-জিনিসটা আমরা পুরোপুরিই মানি এবং আকাঙ্ক্ষা করি—যদিও দরজার আড়ালে। এই অতি-উগ্র সচেতনতা না-থাকায় এরা আমাদের থেকে অনেক বেশী স্বাভাবিক, যদিও এদের 'কৃত্রিমতা'কে আমরা প্রায়ই কটাক্ষ করে' থাকি। আমাদের তথাকথিত আধুনিকাদের নকল ভাব-ভঙ্গি এবং আধা-হজম-করা প্রগতির মধ্যে স্বাভাবিকতা আছে আরো কম। তারা অনেকে এমন-ভাবে চলাফেরা করেন যেন মেয়ে হয়ে জন্মে' পৃথিবীসুদ্ধু পুরুষের মাথা কিনে নিয়েছেন। বিলিতি মেয়েদের তুলনায় রূপে এরা অন্তত দশগুণ খাটো, কর্মক্ষমতায় একশোগুণ খাটো, কিন্তু অহংকারে এবং অবিনয়ে এক হাজার গুণ বড়। এদেশেও পুরুষ ছোটে মেয়ের পিছনে, কিন্তু এখানকার মেয়েদের এমন ভান নেই যে পুরুষজাতির প্রতি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

এদের পারিবারিক জীবনের সমালোচনায় আমরা আরো

বলে' থাকি যে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালোবাসা এখানে গভীর নয় আমাদের মত। বাপ মা ভাই বোনকে দূরে রেখে এরা যে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর করে তাতে প্রকাশ পায় স্বার্থের রাজত্ব। অথচ আমাদের গর্বের বস্তু যৌথ-পরিবারের আনাচে কানাচে এত রকম ঘৃণ্যতা নীচতা ক্ষুদ্রতার পোকা দিবারাত্রি কিলবিল করে যে দেখে মনুষ্য-জন্মের প্রতি ধিক্কার আসে মনে। স্বার্থ যে কতদূর ক্ষুদ্র হতে পারে তার চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সেখানে। এদের শাশুড়ি-বৌ, বৌদি-ননদ, গরিব এবং ধনী ভাই যদি একগৃহে বাস করতো তবে হয়তো কাদা জমে' উঠতো আমাদেরই মত; সুতরাং, অন্তর্নিহিত চারিত্রিক উদারতার জন্য এদের গুণ না গাইলেও, এরা যে যৌথ-ঘরকন্নাকে বর্জন করেছে সমাজে সেজন্য এদের বিবেচনাবুদ্ধির উৎকর্ষ স্বীকার করতেই হয়।

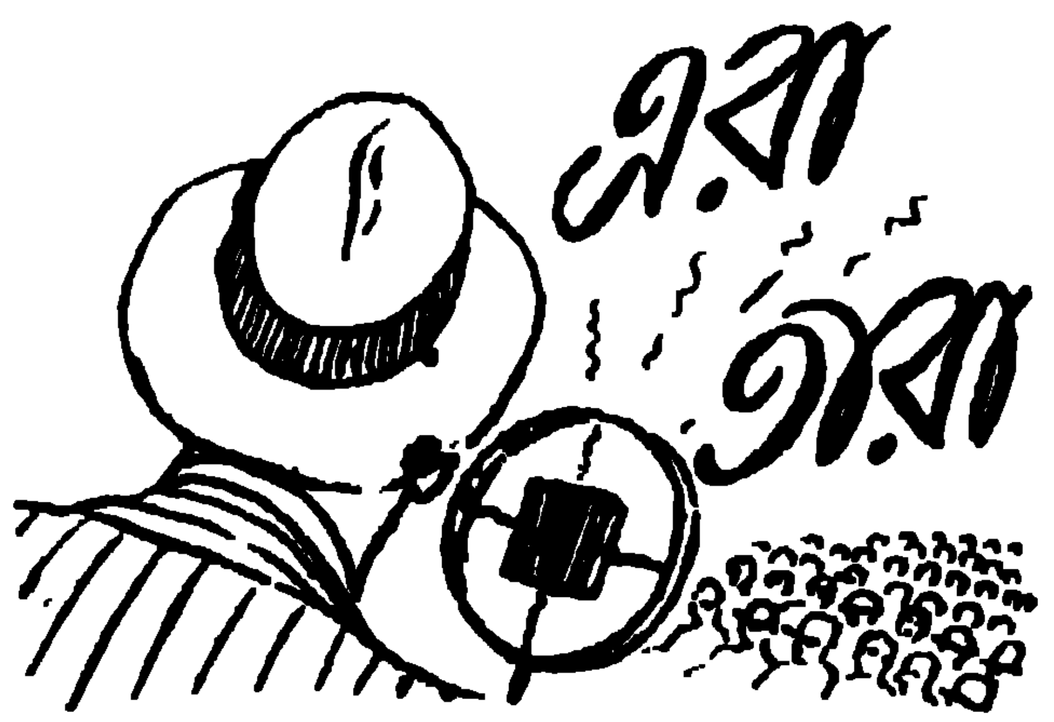

নর্মা বললে, 'হাতে একঘণ্টা সময় আছে। এ-সময়টুকুর জন্য তোমাকে সঙ্গ দিতে পারি।'

'কৃতার্থ হলাম। এ-অনুগ্রহের পরিবর্তে আমি ডিনার-এ নিমন্ত্রণ করতে পারি কি তোমাকে?'

'খাওয়াটা বাড়ি যেয়েও হতে পারে,' সে বললে, 'তাতে পয়সা বাঁচবে, এবং এদিকে সময়টা অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে।'

'যথা?' আমি প্রশ্ন করলাম, 'রবিবারের সন্ধ্যা। একটা নিউজ-সিনেমা খোলা নেই যে একঘণ্টা কাটিয়ে আসবে। আচ্ছা তোমাদের এই পোড়া দেশে রবিবারে থিয়েটারগুলি বন্ধ থাকে কেন বলতে পার? তাছাড়া, বাইরে আজ আমাকে

খেতেই হবে, আমার গৃহকর্ত্রী রবিবার রাত্রে খেতে দেন না। তোমার বাড়িতেও উনুন ধরাবে না জানি,—টিন খুলে দেবে স্পাম অথবা সার্ডিন। সুতরাং আমার পয়সার প্রতি বেশী মায়া দেখিয়ে লাভ নেই, চল কোথাও ঢুকে পড়ি।'

টটেনাম কোর্ট রোড, অক্সফোর্ড স্ট্রীট ও চেআরিং ক্রস রোড-এর মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। তিনটেই বড় রাস্তা, কিন্তু আজ রবিবারের সন্ধ্যায় এখানেও বেশী লোকজন নেই, দোকান পাট বন্ধ। শীতও পড়েছে মন্দ না। রেস্তরাঁ-গুলি অবশ্য খোলা আছে, সিনেমাতে আছে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান।

চেআরিং ক্রস রোড-এর দিকে দেখিয়ে বললাম, 'এ পথে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে এক গলির মুখে আছে চমৎকার একটি চিনে রেস্তরাঁ। ভাজা noodle এবং কুচো চিংড়ি দিয়ে ওরা একটি অতি সুস্বাদু জিনিস বানায়।'

নর্মা দ্বিধার ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলো, তারপর হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'ঠিক হয়েছে। মার্ব্‌ল আর্চ-এর কাছে আমি জানি একটি সুন্দর জায়গা। তোমার ভাল লাগবে নিশ্চয়। ঐ বাস্‌টা ধরি চল,' বলে' সে দৌড়ালো এক ৭৩ নম্বর বাসের পিছনে।

অক্সফোর্ড স্ট্রীট-এর প্রায় অপর মাথায় মাউণ্ট রয়াল হোটেলের পিছন দিকে এক নিরিবিলি নিস্তব্ধ গলি, নাম

Granville Place। গলির মাঝামাঝি এক সাধারণ বাড়ি,—বাইরের থেকে বুঝবার উপায় নেই কিন্তু ঢুকে বোঝা গেল সেটা রেস্তরাঁ। এগিয়ে এলেন এক বিদেশী প্রৌঢ়া মহিলা, নর্মা-কে সম্ভাষণ জানিয়ে আমার দিকে মিষ্টি হেসে নিয়ে গেলেন অপেক্ষাকৃত ছোট এক ঘরে, কোণের দিকে জায়গা করে' দিয়ে আবার মিষ্টি হেসে বিদায় নিলেন। অদূরে গন্‌গনে উনুনের উপর চাপানো সুরুয়ার গামলা; তারি থেকে গরম গরম পরিবেশন করা হচ্ছে, খরিদ্দারের সামনে খাঁটি দুধ দুইয়ে দে'য়ার মত। ঘরে আলোর জোর কম, লোক বেশী নেই। যারা আছে তারাও সবাই কেমন স্তিমিত এবং অনুচ্চারিত। বাইরের শীতের পরে আগুনের পাশে এই কোণটিতে বসে' জায়গাটিকে সত্যিই খুব ভাল লাগলো।

বললাম, 'এটা তুমি আবিষ্কার করলে কী করে' ?'

আত্মপ্রসন্ন নর্মা বললে, 'কেমন, তোমার চিনে রেস্তরাঁর ওপর টেক্কা দিয়েছি তো। এদের রান্নাও অতি সুস্বাদু। যিনি আমাদের নিয়ে এলেন ঐ মহিলাই দোকানের মালিক, চেকোস্লোভাকিয়া-র লোক। কেমন অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন লক্ষ করছো ? ভাবছে তুমি আমার নবতম বয়-ফ্রেণ্ড।'

তুষার-শীতল স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবতম ? এর আগে ক'টি বয়-ফ্রেণ্ড উনি দেখেছেন তোমার ?'

'বোকার মত কথা বলো না,' সে বললে, 'তুমি আমার বয়-ফ্রেণ্ড নও তা ভাল রকমই জান।'

'আমি নই ? তবে সে কে ?'

'কেউ নয়। বয়-ফ্রেণ্ড শব্দটাই আমি দেখতে পারি নে।'

'আচ্ছা তবে : প্রিয়তম, মিষ্টি-হৃদয়, মধু, চিনি—তোমাদের ভাষায় তো অনেক শব্দই আছে। এর কোনোটা আখ্যা দিতে রাজী আছ আমাকে ?'

নর্মা-র অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি আমাকে প্রায় দগ্ধ করে' ফেলছে এমন সময়ে পরিবেশিকা এসে উদ্ধার করলে।

নর্মা খাদ্যতালিকা পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট; মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বিদেশী উচ্চারণে বললে, 'Are you a vegetarian, sir ?'

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে তারপর গম্ভীর-ভাবেই বললাম, 'No, I am a cannibal।'

এবার অপ্রস্তুত হল প্রশ্নকর্ত্রী। সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করলে, 'What mean cannibal ?'

এদিকে নর্মা হাসছে, তা দেখে মেয়েটা পাছে কিছু ভাবে তাই তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করলাম, 'ক্যানিবাল হচ্ছে তারা যারা মানুষের মাংস খায়—বিশেষ করে' তোমার মত সুন্দরীদের নরম কচি মাংস। সুতরাং পালাও শিগগির।'

রসিকতার তাৎপর্য ধরতে পেরে এবার সেও হাসলো।

তাকে বিদায় করার পর নর্মা বললে, 'ও রকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হঠাৎ তোমাকে করলে কেন বল তো ? ও তোমাকে বুঝেছে ভারতীয় বলে',—আর ওদের দেশে হয়তো তোমাদের সম্বন্ধে ধারণা ঐ রকমই। বোধহয় শুনেছে তোমরা সাধু সন্ন্যাসীর জাত, কামিনী কাঞ্চনে স্পৃহা নেই—নিরামিষ খাও আর জপতপ কর। আমরা ইংরেজরা তোমাদের এত দেখি এদেশে, কিন্তু আসলে তোমরা কি রকম সে-সম্বন্ধে অল্পই জানি।'

এখানে ভারতীয়দের মোটামুটি তিন দলে ভাগ করা যায়। এক, যারা অল্প সময়ের জন্য আসেন হয় বেড়াতে নয়তো ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে নয়তো ভারত সরকারের নানাবিধ কমিটিতে বা দূত-দলে প্রতিনিধি হয়ে। এঁরা সাধারণত আসেন উড়ে', থাকেন পিকাডিলি বা পার্ক লেন পল্লীর বড় হোটেলে। আজ এখানে কাল সেখানে করে' য়োরোপ আমেরিকা ঘুরে জিনিসপত্র কিনে কিছুদিন পরে ঘরে ফিরে যান। সাধারণত এঁরা আসেন শীতকালটা বাঁচিয়ে, পয়সার ভাবনাও নেই, সুতরাং বলা বাহুল্য তিন দলের মধ্যে এঁরাই সবচেয়ে সুখী। এই দলে আছেন দিল্লী সেক্রেটারিয়েট-এর বড় চাকুরে, বেসরকারী রাজনৈতিক নেতা, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। আমাদের গরম দেশে এঁরা

অনেকেই উঁচু আসনে এত গরম হয়ে বসেন যে আমাদের মত আপাঙ্‌ক্তেয়দের পক্ষে সেখানে তাঁদের কাছাকাছি ঘেঁষা কঠিন। এই ঠাণ্ডার দেশে কিন্তু তাঁরা নেমে আসেন সমান সমান, হেসে আলাপ করেন অনেকক্ষণ ধরে', আমাদের গরিব-খানায় পাএর ধুলো দেন, কারি-পাউডার দিয়ে আনাড়ী হাতের রান্না দেশী তরকারির স্বাদ গ্রহণ করেন পরমানন্দে, দ্বিতীয় বার দেখা হলে নামটা পর্যন্ত প্রায়ই মনে করতে পারেন, হয়তো বা লাঞ্চ-এও ডাকেন। আমরা কৃতার্থ হয়ে এঁদের ঝঞ্ঝাটের কাজ কিছু কিছু করে' দি, হয়তো কুপন-বইএর একটা পাতাই দান করে' ফেলি গিন্নির কাপড় কেনার জন্য। আশীর্বাদ করে' যখন বিদায় নেন এঁরা, আশায় আশায় বলি: দেশে ফিরে দেখা করবো।

দ্বিতীয় দলে তারা যারা এখানে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এদের মধ্যে আছেন ডাক্তার, আইনজীবী, রেস্তরাঁর মালিক এবং ওয়েটার, অন্যান্য ব্যবসায়ী, এমনকি কয়েকজন বেকারও। এ-দলের কেউ হয়তো যৌবনে পড়তে এসেছিলেন, পড়াশুনো হয়নি, দেশে ফেরেন নি কারণ সেখানে চাকরি জুটবে কিনা সন্দেহ। কেউ বা বিয়ে করেছিলেন, বাপ-মা'র ভাল লাগে নি সেটা অথবা স্ত্রীর ভাল লাগে নি বাপ-মা'কে কিংবা আমাদের দেশটাকে, সুতরাং থেকে গেছেন এখানেই। ইণ্ডিয়া-হাউস অর্থাৎ হাই কমিশনার-এর

আপিশ এদের কাণ্ডারী—সেখানে একটা চাকরি জুটে যায়। আর আছে নিচু স্তরের এক শ্রেণীর লোক; কেউ বা দেশী রেস্তরাঁয় কাজ করে, কেউ কারখানার ঠিকে মজুর। গুণ্ডামি বা জোচ্চুরি যাদের পেশা এমন লোকও আছে; কোন্ কালে হয়তো জাহাজের খালাসীগিরি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। আইডেন্টিটি কার্ড, রেশন বই ইত্যাদির বালাই নেই এদের। লণ্ডনের ইস্ট্ এণ্ড-এর আনাচে কানাচে বেসমেণ্ট-এ শুঁড়িখানায় এদের আড্ডা। পাড়ার ভদ্র-লোকেরা :কোনো কোনো এলাকায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করতে ভয় পায় এদের দৌরাত্ম্যে।

মনে পড়ে বার্মিংহাম-এর এক অভিজ্ঞতা। বেড়াতে এসেছি তিন সঙ্গী, ইচ্ছে হয়েছে দেশী রেস্তরাঁয় খাবো। খুঁজে পাই না দোকান, ভারতীয় দেখলে খোঁজ করি। শেষে একটি ছোকরা বললে, দেশী রেস্তরাঁ তো নেই এ-শহরে তবে আমাদের গরিবখানায় যদি দয়া করে' আমাদের সঙ্গে খাও হয়তো একটুখানি তৃপ্তি হবে তোমাদের। প্রথমে আপত্তি করলাম, কিন্তু পরে তার আগ্রহাতিশয্যে রাজী হতে হল। বাসে উঠেছি,—চলেছি তো চলেইছি। হঠাৎ তিন জনেরই মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধার উদ্রেক হল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, টিপ টিপ বৃষ্টি,—অজানা অচেনা জায়গায় এ কোথায় নিয়ে ঢোকাবে কে জানে। লোকটার জামা কাপড় ছিন্ন, অপরিচ্ছন্ন।

একটু আগে জিজ্ঞাসা-বাদে জানাজানি হয়েছে সে মুসলমান, আমরা হিন্দু। অবশেষে শহরের সীমান্তে এক সরু অন্ধকার গলির কোণে এক অমার্জিত বাড়িতে যেয়ে ঢুকলাম। ঘরে ষণ্ডামার্ক পাঁচ-সাতটা লোক, পাঞ্জাবী মুসলমান। একজন চাপাটি বেলছে, আরেকজন গন্‌গনে আগুনের উপর তা-ই সেঁকছে। আর সবাই এদিকে ওদিকে বসে' আসর জমিয়েছে। আমাদের অভ্যর্থনা করে' বসালো, আলাপ আলোচনা আরম্ভ হল। পাশের ঘর থেকে একটি কুশ্রী নোংরা ইংরেজ মেয়ে বেরিয়ে এসে একজনের থেকে একটা সিগরেট কেড়ে নিয়ে সবার সঙ্গে খানিকটা রসিকতা করে' বেরিয়ে গেল। তখন কলকাতায় আগস্ট-দাঙ্গা চলেছে, আলোচনা এসে পড়লো সেই প্রসঙ্গে—প্রাণপণ চেষ্টাতেও এড়াতে পারা গেল না। ঘরের সঙ্গে উন্মুক্ত বিরাট বাহির-বিশ্বের যোগাযোগ যে-একমাত্র দরজা দিয়ে তার পাশে প্রকাণ্ড যোয়ান একটা লোক মস্ত একটা গরু-কাটা ছুরিতে শান দিচ্ছে। আমাদের তিনজনেরই সঙ্গে কিছু টাকাও আছে। অবশেষে প্রাণপণে ইংরেজের মুণ্ডপাত আরম্ভ করা গেল। হিন্দুও ভাল, মুসলমানও ভাল —শয়তান ইংরেজের চক্রান্তে আজ ভাইএ ভাইএ এই হানাহানি। ইংরেজই আসল দুশমন। বাপ-ঠাকুর্দার আমলের এই নির্ভরযোগ্য বাঁধা ফর্মুলা আজ পর্যন্ত অগণিত তর্কের সহজ সমাধান করে' এসেছে। কিন্তু সম্ভবত এই ব্রহ্মাস্ত্রের

সত্যি প্রয়োজন ছিল না। মাংসের সুরুয়া এবং চাপাটি দিয়ে গরিবের খানা খেলাম, কিন্তু ওদের আতিথেয়তায় ত্রুটি ছিল না কিছু। তা হক, কিন্তু সে-বাড়ি ছেড়ে অবশেষে যখন আবার উন্মুক্ত বড় রাস্তায় এসে পড়লাম তখন টের পাওয়া গেল যে-স্বস্তির স্বাদ সেটাও আমরা কম উপভোগ করি নি মাংসের ঝোলের চেয়ে।

এই দুই দলের বাইরে যারা আছেন তৃতীয় দলে, তাদের অধিকাংশই ছাত্র। যুদ্ধের আগে এরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে' গেছেন এদেশে,—এখন আর সেদিন নেই। যুদ্ধের মধ্যে সংখ্যায় ছিলেন এরা নগণ্য, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের মত এমন ছেয়ে ফেলেছে দেশটা যে ইংলণ্ডের শ্বেতাঙ্গে কালির ছিটে এখন বেশ ঘন ঘন চোখে পড়ে। এই পঙ্গপালের যারা অগ্রদূত তাদের আসতে হয়েছিল সৈন্যবাহী জাহাজে, পথে কষ্টের নাকি অন্ত ছিল না। আলো বাতাস-হীন খোলের মধ্যে একঘরে একশো জনের আস্তানা, দড়ির হ্যামাক্-এ শোয়া, রান্নাঘর থেকে খাবার বয়ে আনা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দে'য়া, পায়খানা সাফ করা—সব করতে হয়েছে। দু'শো লোকের জন্য গোটা আষ্টেক পায়খানা, তিনটে স্নানঘর। এত কষ্টের পরে এই বাঞ্ছিত দেশে এসে দেখা গেল—স্থান নাই স্থান নাই। আগের দিনে যে সব ল্যাণ্ডলেডি-রা শুনেছি কত রকম তোয়াজ করতো, ডিমাণ্ড

অ্যাণ্ড সাপ্লাই-এর অনিবার্য নিয়ম অনুসারে এখন তাদেরই তোয়াজ করতে হয়। নিচুদরের আশ্রয়ের জন্য উঁচু দর দে'য়ার পরেও সদাসর্বদা তাদের তুষ্ট করে' চলতে হয়। নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি কারো কারো বড় বেশী,—এদিক ওদিক হলে পথ দেখিয়ে দেবে। অনেকের নাকি হাঁচি কাশি সম্বন্ধেও নিয়ম আছে। একবার আমার বরাতে জুটেছিলেন এক গৃহকর্ত্রী তার বাতিক ছিল নোটিশ লাগাবার; ঘরে ঘরে সিঁড়িতে দরজায় তার নোটিস। কিন্তু যে-নোটিস তার সোনার ফ্রেম-এ বাঁধিয়ে রাখবার মত সেটা ছিল স্নানঘরে: 'স্নানে যেয়ে দরজা বন্ধ করো না, অন্য লোকের জল দরকার হতে পারে'।

বলা বাহুল্য, সবাই এমন নয়। অনেকের সঙ্গেই মানিয়ে চলা সহজ। সাধারণত যেসব নিয়মগুলি মানতে হয়, রুচি এবং সুবিধার দিক থেকে সেগুলি বরং সমর্থনযোগ্যই। কিন্তু আমাদের অনেকের দেখেছি কী এক সূক্ষ্ম জাতীয়তাবোধে বা অন্য কোথাও বাধে এসব রীতি-নীতি মানতে। হয়তো গৃহকর্ত্রীর কাছে কিছু চাইবার সময়ে please বলতে আপত্তি; ভাবটা এই, পয়সা দিচ্ছি তার পরিবর্তে এ তো আমার প্রাপ্য। কিন্তু এদেশে লোকের সাধারণ আচার ব্যবহারে হুকুম বড় একটা চোখে পড়ে না, অনুরোধে সব কাজ চলে। এখানে অধিকারের প্রাপ্য পুরোপুরি পাওয়া যায় অধিকার জাহির না-করে'।

এরা তারা

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে। বলা বাহুল্য, স্নব আছেন নানান জাতের। একবার কেম্ব্রিজে দু'টি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের বলা চলতে পারে য়ুনিভার্সিটি-স্নব। এদের বাবাদের অনেক টাকা। আলাপের ধারা অনেকটা একই রকম :

১নং, 'এদেশে এসেছি এদের কাল্‌চার imbibe করতে। সুতরাং কেম্ব্রিজে না-এসে উপায় কি! নয়তো অক্সফোর্ডে কিংবা লণ্ডনে যেতে পারতুম। সেজন্য খরচও একটু বেশী। কত খরচ হে আমাদের, ২নং ?'

২নং, 'তা প্রায় তিনশো পাউণ্ড-এর মত যেয়ে পড়ে মাসে।'

১নং, 'কিন্তু সে কিছু নয়—এদের কাল্‌চার imbibe করতে হলে...'

এই ১নং কাল্‌চার-পূজারীকে পরে দেখা গিয়েছিল গেঁায়ো লণ্ডনের কোনো প্রোলেটারিয়ান পাড়ার হোটেলে এক চাকরানী ছুঁড়ির সঙ্গে বাস করতে।

২নং কিন্তু সেরকম দুর্বলচিত্ত লোক নন, তার নিজের মুখে শোনা এক গল্পেই আছে প্রমাণ। গৃহকর্ত্রীর মেয়ে (সুন্দরী এবং ষোড়শী, বলাই বাহুল্য) কতদিন কত রকম ছলা কলায় তার কালচার-তপস্যার টনক নড়াতে চেয়েছে, কিন্তু ২নং-এর সংযম ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকেও হার মানায়। একদিন রাতে ঘরে ফিরে বিছানায় ঢুকে নরম এবং গরম যে-জিনিসটার স্পর্শে সে

চমকে উঠলো সেটা হট-ওআটার ব্যাগ নয়, আমাদের গল্পের নায়িকা। পাঠক, বলুন তো ঋষ্যশৃঙ্গ কী করলেন?…না, যা অবশ্যম্ভাবী তা হল না, কেম্‌ব্রিজে আসা তার বৃথা হয় নি। নায়িকাকে ফিরে যেতে হল তার নিজের ঘরে, ব্যর্থ-মনোরথে।

সম্প্রতি ইংরেজপ্রীতি আর তত ফ্যাশানেব্‌ল নয়। এই ধরণের স্নবারি-র উপাসক যারা এখন তারা মাইনরিটি—সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। এখন জয়জয়কার তাদের যারা আমাদের জাতীয় কৃষ্টির ধ্বজাধারী। নতুন যুগের এই অগ্রদূতদের অন্তর্দৃষ্টি ইংরেজের তথা য়োরোপের সব কিছুর অন্তর্নিহিত গলদ এবং দোষ খুঁজে বা'র করতে পারে অনায়াসে; এবং তুলনা-মূলক বিচারে আমাদের সব কিছুই যে এদের সব কিছুর চেয়ে শ্রেয় এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ এরা রাখে না। উইণ্ডসর দুর্গের সামনে একবার এরকম একজনের মন্তব্য শুনতে হয়েছিল যে 'আমাদের' সম্রাট আকবরের পায়খানাটাও এর চেয়ে বড় ব্যাপার! সেটা না হয় মানলাম; কিন্তু ইংরেজ কি এর আষ্টেপৃষ্ঠে নোটিস মেরে' রেখেছে: 'এমনটি আর দেখি নাই কভু আমার যেমন আছে'?

এরা 'জাতীয়তাবোধ' প্রকাশ করে রোজ দাড়ি না-কামিয়ে পথে ঘাটে চীৎকার করে' কথা বলে', 'please' শব্দ ব্যবহারের কার্পণ্যে। ভাবটা এই—এদের নিয়মই যে মানতে হবে তার

কী মানে আছে, আমাদেরটা খারাপ কিসে! কেন যে এরা কোট প্যাণ্টুলুন পরেন সেটাই আশ্চর্য।

এদের অনেকে ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা দেখান নিজের এবং পরের চরিত্র-রক্ষার কাজেও। ('চরিত্র' শব্দ এখানে আমাদের সমাজের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি—যে-অর্থে একমাত্র পর-নারীর প্রতি আসক্ত ব্যক্তিই চরিত্রহীন।) এরা স্ত্রী-সংসর্গ পরিহার করেন কারণ এখানকার মেয়েরা নাকি সব ছদ্মবেশী ডাইনী; ফাঁদ পেতেই রেখেছে এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অসাবধানী পুরুষের চরিত্রে কলঙ্ক আনা। সুতরাং এরা মেয়েদের এড়িয়ে চলেন এবং যেসব দুর্বলমতি অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিরা হয়তো বিপথে যাবার রকম-সকম দেখান তাদের সৎপথে রাখবার জন্যও অনেক পরিশ্রম করেন। কোনো ভারতীয় যদি দেশের অতুলনীয় সচ্চরিত্রতার আদর্শে কলঙ্ক লেপন করে তবে সে-লজ্জা যে তাদেরও! সুতরাং কাউকে যদি দেখা যায় কোনো মেয়ের সঙ্গে হেসে কথা কইতে (এসব দেখে শুনে বেড়ানো অবশ্য তাদের কাজ নয়—যদি চোখে পড়ে) তবে সে-ঘটনা এবং তার গূঢ় তাৎপর্য চতুর্দিকে রাষ্ট্র হতে দেরি হয় না,—দরকার হলে দেশে পর্যন্ত খবর চলে' যায়। যাদের ভালর জন্য এত করা তারা কিন্তু বলে যে আসলে এই স্বর্ণচরিত্র ব্রহ্মচারীদের ব্যবহার ঈর্ষাপ্রসূত। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে না যেই ভীতুর দল তারা দেখাতে চায় তারা

চায় না, মিশতে। তা যদি না হবে তবে দৈবাৎ কোনো মেয়ের সঙ্গে একটুখানি আলাপ হলে তারা এমন গদগদ ভাবে শ্রদ্ধাবিগলিত হয়ে পড়েন কেন! হয়তো স্ত্রীসঙ্গ-বিবর্জিত জীবনে এদের যৌন-প্রবৃত্তির তাপ অস্বাভাবিক রকম প্রখর। দুর্জনেরা এ-কথাও বলবে স্ত্রীলোকের ছায়া বাঁচিয়ে না-চললে যে-চরিত্র রক্ষা হয় না সে-চরিত্র গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা এদেশের লোকের কাছে নিজেদেরকে হাস্যাস্পদ করেন, হয়তো অজ্ঞাতসারে। এক ভদ্রলোককে মনে পড়ে তার ধারণা ছিল যে কী ভারতে কী বিলেতে মেয়েরা তাকে পাবার জন্য পাগল—কিন্তু তার যোগ্য কেউ নয়। এই কথাটা ডিনার-টেবিলে লাউঞ্জ-এ সর্বত্র মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে' তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। তিনি ইংরেজি বলতেন পরিষ্কার সিলেটী উচ্চারণে, যদিও ভাষা এবং উচ্চারণের নির্ভুলতা সম্বন্ধে তার গর্ব ছিল প্রচণ্ড। ভদ্রলোকের রং কালো, এবং দন্তপাটি বিকশিত করে' সদা-সর্বদা নানারকম মুখবিকৃতি করা তার অভ্যাসের মধ্যে ছিল। আশ্চর্য নয় যে এসব মুদ্রার সমঝদার মেয়ে আজ পর্যন্ত তিনি পান নি।

ইংরেজি বলাতে ব্যাকরণের ভুলে ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালী বোধহয় অগ্রগণ্য এবং উচ্চারণের বিকৃতিতে হয়তো

দক্ষিণীদের পরেই তার স্থান। (আমাদের সান্ত্বনা এই যে প্রতিবেশী চিনেদের ইংরেজি উচ্চারণ আরো দুর্বোধ্য।) একজনকে জানতাম যার প্রতি বাক্যে ব্যাকরণ এবং উচ্চারণ তো লাঞ্ছিত হতই, উপরন্তু এমন সব নতুন নতুন শব্দ তিনি উদ্ভাবন করতেন যা কোনো অভিধানে নেই। নিজেকে ইনি মনে করতেন একজন মস্ত বক্তা। বক্তা তিনি ছিলেন সন্দেহ নেই—নিঃসংকোচে অনর্গল বকে' যেতেন—কিন্তু ইংরেজ-শ্রোতা তার বক্তব্য বুঝতো কিনা সন্দেহ। না-বুঝলেও সৌজন্যের বশে এরা মন দিয়ে শুনবার ভান করতো, বক্তা ভাবতেন তারা তার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছে এবং ক্রমেই আরো 'ওজস্বিনী' ভাষা বেরিয়ে আসতো। আশ্চর্য এই যে ভারতীয়দের অনেকে তাকে সত্যিকারের বাগ্মী বলেই মনে করতো।

ছাত্রদের কথা ছেড়েই দিলাম। একবার দেশের কোনো প্রসিদ্ধ ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রসিদ্ধ সম্পাদকের বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ইনি সভায় এলেন প্যান্টলুনের উপর গলা-বন্ধ কোট এবং তার উপর দামী শাল জড়িয়ে। তার বক্তৃতায় একটা শব্দ বারে বারে কানে লাগছিল—তা হচ্ছে 'ফুটুস্টেপ'।

ভারতীয় ছাত্র সম্প্রতি এদেশে অনেক বেড়ে গেছে। সরকারী বৃত্তি নিয়ে যারা এসেছেন তারাই সংখ্যায় বেশী।

তাদের মধ্যে অনেকে আছেন খুবই উপযুক্ত,—অনেকে ততটা নয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থান-সংকোচ—সে অবস্থায় জায়গা পাবার সৌভাগ্যকে সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি কেউ কেউ। ভারতীয় ছাত্রের 'নবমক্কা' আমেরিকার থেকেও এ-ধরণের অনুযোগ শোনা যাচ্ছে। মনে হয়, নির্বাচনের সময়ে আমাদের কর্তারা ছাত্রের কৃতিত্ব সর্বদা সর্বাগ্রে বিবেচনা করেন নি। এমনও দেখেছি, ভূতত্ত্বের ছাত্র এদেশে এসেছেন পদার্থ-বিজ্ঞান শিখতে; বৃত্তি একটা তাকে দিতেই হবে এবং ভূতত্ত্বের জন্য লোক দরকার নেই—সুতরাং কী করা যাবে!...কিন্তু এদেশের মাষ্টার মশাইরা এ-ধরণের যুক্তি সব সময়ে উপলব্ধি করতে পারেন না।

মেয়েরাও আজকাল আসছেন দলে দলে। লণ্ডনের পথে ঘাটে শাড়ি-পরা মূর্তি এখন আর কৌতূহলের উদ্রেক করে না। পরিতাপের বিষয় যে ইংরেজের মনে শাড়ি যতটা প্রশংসার উদ্রেক করে শাড়িধারিণীর সৌন্দর্য ততটা করে না। তার কারণ উচ্চশিক্ষার দিকে সাধারণত তারাই যান রূপের অভাবে যাদের বিয়ে হয়নি। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে। আর, রাজা মহারাজার রানী বেগম বা বড় ঘরের সুন্দরী ঘরনী যারা আসেন তারা গাড়ি চড়ে' চলাফেরা করেন, সাধারণ ইংরেজ যুবকের দৃষ্টিপথে বড় একটা পড়েন না। মেয়েদের মধ্যে এক একজনকে মাঝে মাঝে দেখি যারা পোশাকে

প্রসাধনে মেমসাহেবদের অনুকরণ করে' এমন খিঁচুড়ির সৃষ্টি করেন যে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনোরকম বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একবার রাস্তায় জনৈকা স্ল্যাক-পরিহিতা ভারতীয়াকে দেখিয়ে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, দেখ উনি সুন্দরী, কিন্তু পাজামা পরে' সব নষ্ট করে' ফেলেছেন। শাড়িতে ওকে চমৎকার দেখাতো। তাছাড়া উনি অন্তঃসত্ত্বা—ঐ অবস্থায় আমরা ওসব পারি না।

লণ্ডনে ভারতীয় সংঘ সমিতি আছে গোটাকয়েক। তার মধ্যে কৃষ্ণ মেনন প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া লীগ এখন সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী। ছাত্রদের সভা আছে লণ্ডন মজলিস। মাঝে মাঝে চা, ডিনার, বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন করেন এসব সভা-সমিতি। সঙ্গে প্রায়ই থাকে গান, বাজনা, নাচ। একই লোকের গান, একই লোকের নাচ—মাসের পর মাস। তবু দল বেঁধে এসে জড়ো হয় প্রবাসী চাতকের দল। এই নিস্তরঙ্গ একঘেয়েমির মধ্যে সেদিন নতুনত্বের ঢেউ তুলে গেলেন রামগোপাল। তার নাচের চেয়ে আরো ভাল লাগলো নাচের ব্যাখ্যা। আর, অতি সুন্দর তার ইংরেজি বলা!

ভারতীয়দের দ্বিতীয় মিলনকেন্দ্র দেশী রেস্তরাঁগুলি, লণ্ডনে যাদের সংখ্যা প্রায় গোটা পনের কুড়ি। কারি-পাউডার

দিয়ে রান্না ব্যঞ্জন এমন কিছু সুস্বাদু নয়, দামও বেশী, কিন্তু লোভ সামলানো যায় না। কোথাও কোথাও মেলে ভাত,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাপাটি এবং পরোটা। বহু ইংরেজ এবং অন্যান্য অভারতীয় আসেন এসব জায়গায় খেতে, কিন্তু সত্যিকারের উঁচুদরের জমকালো দোকান একটিও নেই। পিকাডিলি-র বীরস্বামী রেস্তরাঁয় ঠাট আছে কিছুটা—পাগড়ি-বাঁধা হেড ওয়েটার অভ্যর্থনা করে' জায়গা দেখিয়ে দেয়, শাড়ি-পরা মেমসাহেব ওআইন-ওয়েট্রেস বোতল থেকে সুরা ঢালে পাত্রে,—কিন্তু অন্ন-ব্যঞ্জনের মধ্যে ভারতীয়তার গন্ধই আছে, স্বাদ নেই।

গাওআর স্ট্রীটের পুরনো ছাত্রাবাসের যেটুকু বেঁচেছে বোমার থেকে তার মধ্যে টিম টিম বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন প্রৌঢ়া মিস্ আণ্ডারউড। সেখানে একটা সাজানো-গোছানো ঘরে রাখা ছিল নানাবিধ দেশী বিদেশী পত্রিকা, পিয়ানো, খেলার সাজ-সরঞ্জাম। এই দুর্দিনেও চমৎকার মিষ্টি কেক বানিয়ে খাইয়ে মিস্ আণ্ডারউড কতবার বলেছেন, তোমরা এসো এখানে, দু'দণ্ড বসো, নিজেদের মধ্যে দেখাশুনো হবে।—কেউ বড় একটা যেত না। সম্প্রতি ভিন্ন পাড়ায় ভারতীয় ছাত্র ইউনিয়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনো সামাজিক দেখাশুনোর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র দেশী রেস্তরাঁ।

খাওয়া শেষ করে’ বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসা গেল হাইড পার্ক-এর কোণে। নর্মা ঢুকলে সুরঙ্গে, তাকে যেতে হবে বাড়ি, পড়াশুনোর কাজে।

পার্কের মধ্যে বেশ একটা সোরগোল চলছে। রবিবার বিকেল থেকে এখানে বক্তাদের আসর জমে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু নানাবিধ, তার মধ্যে ধর্ম আর রাজনীতিই প্রধান। মতামত বিভিন্ন, ভাষায় কারো জ্বালা কারো বা উচ্ছ্বাস, কারো নিপুণ বাক্-চাতুর্য। এই বৈচিত্র্যের আসরে শ্রোতাদের দানও কম নয়। প্রশ্ন ও পরিহাসের বাণে তারা জর্জরিত করে বক্তাদের, যদিও এসব ঝানু বক্তাদের মোটা চামড়া ক্ষত করতে পারে না তাদের অস্ত্র। এসব শ্রোতাদের অনেকেই অকাজের অবসরে এসে জড়ো হয়, বিরস সন্ধ্যায় একটুখানি মজার খোঁজে। এক ভীড় থেকে আরেক ভীড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে কিছুক্ষণ সময়টা মন্দ কাটে না। মঞ্চের বক্তারা প্রসিদ্ধ জননেতা কেউ নয়, যদিও কেউ কেউ হয়তো বাগ্মিতায় বিখ্যাতদের অনেককে হার মানাবে।...

দেশী এবং বিলাতী কোনো কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কাছাকাছি এসে দেখবার এবং শুনবার সুযোগ হয়েছে এদেশে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রীর জরুরি ডাকে এলেন নেহেরু, জিন্না, বলদেও সিং। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান-এর ব্যাখ্যা নিয়ে কংগ্রেস এবং লীগ-এর মধ্যে মতদ্বৈধ।

দু'চারদিন ঘন ঘন বৈঠক এবং পরামর্শের পর খোদ কর্তারা রায় দিলেন জিন্নার পক্ষে।

তখনো রায় প্রকাশ পায়নি, এমন সময়ে ইণ্ডিয়া লীগ-এর এক অভ্যর্থনা সভায় এলেন নেহেরু এবং বলদেও সিং। কিংসওএ হল্ গমগম করছে লোকে, অনেক আগে যারা না-এসেছে তারা বসবার জায়গা পায় নি। সন্ধ্যার সময়ে নেহেরু এলেন সোজা অ্যাটলী সাহেবের বৈঠক থেকে, রেজিনাল্ড সোরেনসেন-এর সঙ্গে। প্রথমে সমস্ত ঘরটি ঘুরে ঘুরে পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গে স্মিতহাস্যে নমস্কার বিনিময় ও বাক্যালাপ করলেন। খুব কাছের থেকেই দেখলাম—পরনে সাধারণ স্যুট, বিরলকেশ মাথা। তারপর সভাপতি সোরেনসেন-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর বক্তৃতা করলেন প্রথমে হিন্দুস্থানিতে, পরে ইংরেজিতে। বক্তৃতার সময়ে হাতের রুমালটা আঙুলে জড়াচ্ছেন আর খুলছেন। নেহেরু-র বক্তৃতা জনতাকে উত্তেজিত, উচ্ছ্বসিত করে না—কারণ তাঁর ভাষায় নেই জ্বালা বা উচ্ছ্বাস, সুরে নেই উত্থান-পতনের তরঙ্গ। বিষয়বস্তু যাদের ভাল লাগবে তারাই উপভোগ করবে নেহেরুর বক্তৃতা। তেমন লোক বেশী নেই কোনো দেশেই,—জনতা চায় স্লোগান, 'জ্বালাময়ী ভাষা'। আরেকটা জিনিস লক্ষ করবার ছিল; সে সময়ে তিনি নিশ্চয় জানতেন যে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার রায় যাবে তাঁর

বিপক্ষে, তবু তাঁর কথায় বা ভাবে ছিল না বিন্দুমাত্র তিক্ততা।

নেহেরু ফিরে গেলেন দেশে, জিন্না রইলেন। কয়েকদিন পরে সেই ঘরেই মুস্লিম লীগ অনুষ্ঠিত সভায় এলেন তিনি। সেদিন ভীড় অনেক কম, তার মধ্যে লীগ-এর ভলান্টিয়ারদেরই বারে বারে নজরে পড়ছে। গোলমালের আশঙ্কায় তারা যেন একটুখানি সচকিত। সেটা আশ্চর্য নয়, কারণ লণ্ডনে মুসলমান আর ক'জন! শ্রোতাদের অধিকাংশই সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক। তাছাড়া আছেন মুষ্টিমেয় জনকয়েক ইংরেজ।

জিন্না সাহেব এলেন, গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। পোশাক দামী এবং নিখুঁত। সোজা যেয়ে মঞ্চের উপরে উঠে বসলেন। কোরান স্তোত্র পাঠ হবার পর তিনি আরম্ভ করলেন বক্তৃতা। ভূমিকায় বললেন, এদেশের লোকদের তিনি জানাতে চান ভারতের ভিতরে সত্যিকার অবস্থাটা কী, সেজন্যই তিনি আজ এখানে এসেছেন। ইংরেজ শ্রোতার সংখ্যাল্পতার জন্য মন্তব্যটা কেমন যেন অনুপযুক্ত শোনালো। জিন্না বলেন তিনি cold-blooded logician। প্রথম দিকে তাঁর ভাষণের ধরণটা ছিল সেই রকমই। কিন্তু পরে তিনি হাত মুখ নাড়তে আরম্ভ করলেন, স্বর মাঝে মাঝে উর্ধ্বে চড়তে লাগলো, বিপক্ষ যুক্তিকে বহু ক্ষেত্রেই উপেক্ষা বা বিকৃত করলেন, এড়িয়ে

গেলেম বহু প্রকট সত্য এবং প্রশ্ন। নোয়াখালিতে হিন্দু মরেছে নগণ্য, কিন্তু বিহারে মুসলমান প্রাণ দিয়েছে অগণ্য। একটি ছেলে উঠে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো (পরে শুনলাম সে নাকি মুসলমান), কিন্তু তার গলার শব্দ শোনা মাত্র চতুর্দিক থেকে হাঁ হাঁ করে' ছুটে এল স্বেচ্ছাসেবকের দল। যতক্ষণ না আপদ বিদায় হল, জিন্না স্থির হয়ে নীরব রইলেন, তারপর আবার আরম্ভ করলেন—যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে।

জিন্নার ইংরেজি উচ্চারণ নিখুঁত, ভাষণ স্বচ্ছন্দ। একটুখানি নাকী সুরের আভাস আছে, বলার কায়দা চার্চিল-এর বক্তৃতা মনে করিয়ে দেয়, বলার ধরণটা যাকে বলে aggressive। বক্তব্যে ছিল কংগ্রেসের ও হিন্দুর বিরুদ্ধে বহু কটূক্তি, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি কথাও নয় অথবা কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একটি প্রশস্তি-বাক্যও নয়। সব শোনার পর এ-প্রশ্ন মনে জাগে,—কংগ্রেস যদি স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ না-করতো কোনোদিন, তবে আজ স্বাধীন সার্বভৌম মুস্লিম রাজ্যের দাবি শোনা যেত কি এমন করে' !

জিন্নার বক্তৃতার পিছনে আছে যাকে বলা চলে 'ফলিত মনস্তত্ত্ব'। শ্রোতার মন দোলাতে তিনি পারেন। স্বপক্ষের মনে জাগে জ্বালা,—হয়তো বিপক্ষেরও। শুধুমাত্র লজিক যার রসদ তার দ্বারা সেটা সম্ভব নয়।

এঁদের কিছুদিন পরে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের আমন্ত্রণে বর্মার ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য এলেন আউং সান এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা। ইণ্ডিয়া লীগ-এর এক অভ্যর্থনা সভায় দেখলাম আউং সান-কে। ৩২-৩৩ বছর বয়স, খাকি সামরিক পোশাক পরনে, খুব ছোট ছোট করে' ছাঁটা চুল। চাএর কাপ হাতে করে' ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারপর বক্তৃতা—তাতে আবেগ বা তেজ কোনোটাই বেশীমাত্রায় ছিল না। কথার মাঝে মাঝে অতি সহজেই হাসি ফুটে উঠছিল মুখে। বয়স এত তরুণ, হাবভাবে নেই দুর্দমনীয় বিক্রমের চিহ্ন—ভেবে আশ্চর্য লাগছিল কী করে' এত দ্রুত এতখানি প্রতিপত্তি তাঁর সম্ভব হল!…এর পর বেশীদিন যায় নি,—অকস্মাৎ সমাপ্ত হল এই উদীয়মান জীবন।

নেহেরুর হিন্দুস্থানিতে উর্দুর প্রাধান্য বেশী, সেজন্য আমাদের মত অনেকের কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ভাষা সহজ, হিন্দিপ্রধান। তাছাড়া, স্ত্রীলোকসুলভ উচ্ছ্বাস থাকাতে তাঁর বক্তৃতার চাকচিক্য এবং আবেদন অনেক বেশী। ইউ. এন. থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা-র অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ে' বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মী দেশে ফিরবার পথে লণ্ডনে এসেছিলেন, সে-সময়ে এক সভায় তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল। মাথার চুল গেছে পেকে, কিন্তু সুরক্ষিত দেহে সুন্দর শাড়িটি বেশ মানিয়েছে; চলন

বলনে স্ত্রীলোকোচিত কমনীয়তা। ইংরেজি বলেন সুন্দর এবং সহজে হাসেন। সব মিলিয়ে শ্রোতার বেশ লাগে। সেদিন সভায় ওঁর সঙ্গে ছিলেন রাজকুমারী অমৃত কাউর।

রাজকুমারীর চেহারায় চাকচিক্য নেই, কিন্তু তাঁর বাচন-ভঙ্গি সুন্দর এবং ইংরেজি মার্জিত। এর আগে একবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে, লণ্ডন মজলিস অনুষ্ঠিত এক ডিনার-এ। ডিনার-এর উদ্দেশ্য ছিল ইউনেস্‌কো-র ভারতীয় প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করা। দলে রাজকুমারী ছাড়া আরো ছিলেন জন সার্জেন্ট, জাকির হোসেন, অমরনাথ ঝা, ইত্যাদি। শহরের সবচেয়ে বড় চিনে রেস্তরাঁ Ley On's, তারই দোতলার প্রকাণ্ড হল-এ আহারের পরিতৃপ্তির পর বক্তৃতার পালা। চিনেদের সব কিছুর চেয়ে আমার ভাল লাগে ওদের খাবার। চর্ব্য-চোষ্যগুলি পরিমাণে যে যথেষ্ট শুধু তাই নয়, স্বাদে অতুলনীয়। খেতে খেতে ভুলে' যেতে হয় যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ইংলণ্ডে বসে' আছি। যেটুকু পাওয়া যায় বাজারে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের বিবেচনা এবং কৃতিত্ব এদের আছে। বিশ্বাস করা কঠিন নয় এদের প্রসিদ্ধ ভোজ্য চপ সুয়ে-র (Chop Suey) উদ্ভাবনার গল্প। এক ক্ষুধার্ত আমেরিকান একদা হানা দিল দূর প্রাচ্যের এক চিনে রেস্তরাঁতে। রাত তখন অনেক, সব খাবার গেছে ফুরিয়ে। কিন্তু আমেরিকান নাছোড়বান্দা। অগত্যা উপায়

না-দেখে ওয়েটার করলে কি রান্নাঘরে যেয়ে ঝড়তি-পড়তি টুকরো-টাকরা যা কিছু পড়ে' ছিল তারই থেকে বানালে এই জিনিস। খেয়ে সাহেবের মহা আনন্দ। সেই থেকে চপ সুয়ে প্রসিদ্ধ। এই সুস্বাদু ব্যঞ্জনে প্রধানত আছে ভাজা ম্যাকারুনি, কুচি কুচি মাংস, নানা জাতের সবজি। কিন্তু আসল স্বাদটা সম্ভবত এসেছে অন্য কিছুর থেকে যা ততটা সহজদৃশ্য নয় এবং যার আড়ালে হয়তো আছে এক অজানা ওয়েটার-এর চৈনিক প্রতিভা।

সেই সন্ধ্যার সভায় প্রথম দেখলাম কৃষ্ণ মেনন-কে। তখন ছিল না তার আজকের পদমর্যাদা, কিন্তু বিলেতে কংগ্রেস আন্দোলনের খবর যারা রাখতেন তারা তাকে জানতেন। এদেশের লোকের কাছে এই সেদিন পর্যন্ত তার ছিল পোলিটিকাল অ্যাজিটেটর-এর খ্যাতি। তাছাড়া তিনি ছিলেন borough council-এর সদস্য, এবং তৎপূর্বে পেঙ্গুইন বইএর সম্পাদক। কিন্তু, বহু বছর ধরে' কংগ্রেসের কাজই ছিল তার একাগ্র সাধনা। ছাত্র বয়সে এসেছিলেন পড়তে, পড়াশুনো শেষ করে' থেকে গেলেন এদেশে, গড়ে' তুললেন কংগ্রেসের মুখপাত্র ইণ্ডিয়া লীগ। বই ছেপে, মিটিং করে', বন্ধুদের দিয়ে পার্লামেণ্ট-এ ভারতের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়ে ইণ্ডিয়া লীগ দেশের কাজ করেছে। স্ট্র্যাণ্ড-এ এক পুরনো বাড়ির ছোট একখানা ঘরে লীগ-এর আপিশ যারা

দেখেছে তারা জানে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এদের ছিল না। এদিকটায় কংগ্রেসের উপযুক্ত সাহায্য পেলে কাজ আরো বেশী হত সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণ মেননের জীবনযাত্রা সরল। নিরামিষাশী, পান করেন না—ধুমপানও না। অবিবাহিত। ঋজু, দীর্ঘ, কৃশ দেহ।

এদেশের নেতাদের মধ্যে তার জুড়ি কৃচ্ছ্রসাধক হচ্ছেন স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স। ভোর চারটেয় ওঠেন, উঠে ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন—কী শীত কী গ্রীষ্ম। মাছ মাংস খান না,—সবজিও কাঁচা হলেই ভাল হয়, বড় জোর সিদ্ধ। দোষের মধ্যে শুধু পাইপ। প্রায়ই আঠারো ঘণ্টা কাজ করেন দিনে। এই সেদিন পার্টি-র থেকে বহিষ্কৃত ক্রীপ্‌স আজ গভর্মেণ্টের কর্ণধার, ক্যাবিনেট-এর সর্বাপেক্ষা উর্বর এর উজ্জ্বল মস্তিষ্ক। চার্চিল পর্যন্ত বলেন, আমাদের ভাগ্য ভাল যে অন্তত একটি প্রথম শ্রেণীর মাথা আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে ঘামছে।

ক্রীপ্‌স-এর সবুজ চোখ বুদ্ধিতে চঞ্চল, কাছের থেকে দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। সে-সুযোগ হয়েছিল ১৯৪৬-এর অক্টোবরে এক চা-পার্টিতে। অতিথি ছিলেন তিনি এবং পেথিক-লরেন্স। তখন ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নিয়ে কংগ্রেস ও লীগ-এ সবে মতদ্বৈধ ঘনিয়ে উঠছে। প্রায় সবার সঙ্গে করমর্দনের পর বৃদ্ধ পেথিক-লরেন্স ক্লান্ত হয়ে

একধারে যেয়ে বসে' রইলেন। ক্রীপ্‌স ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে। কোথাও পাঁচ, কোথাও পনের মিনিট বসেন। কাউকে জিজ্ঞাসা করেন আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে আপনার কী মত, কোথাও বলেন জিন্নাকে বাগ মানানো বড় কঠিন; আর, ভারতে সবচেয়ে বেশী দরকার এখন গঠনমূলক কাজ, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য তার কিছু হতে পারছে না।

ক্রীপ্‌স-এর বক্তৃতাও সুন্দর। যেমন শব্দবিন্যাস, তেমন বাচনভঙ্গি। নেতাদের আর যাদের শুনেছি তার মধ্যে এনাউরিন বিভান উল্লেখযোগ্য বাগ্মী। স্বয়ং চার্চিল নাকি এঁকে ভয় করে' চলেন। আরেকজন, যার সঙ্গে চার্চিল আদায় কাঁচকলায়, হচ্ছেন লেবার পার্টি-র ভূতপূর্ব সভাপতি হ্যারল্ড লাস্কি। বাক্যবাগীশ বলতে যা বোঝায় ইনি তা-ই। দেখতে ঠিক শান্ত গম্ভীর প্রোফেসারটি, কিন্তু নির্বিকার মুখের কথায় কথায় বিদ্রূপ আর তিরস্কারের জ্বালা। প্রকাণ্ড বাক্য অতি অবলীলাক্রমে রচনা করে' চলেন মুখে মুখে—যা সাধারণ লোকে ব্যাকরণ ভুলের ভয়ে চেষ্টাই করবে না এবং যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতেও সময় লাগে কিছুক্ষণ। লাস্কি সাধারণের বক্তা ন'ন, ইনটেলেক্‌চুআল-এর বক্তা।

রেজিনাল্ড সোরেনসেন কিন্তু ঘরের বক্তা ন'ন, মাঠের বক্তা। পার্লামেণ্টে-এর বক্তৃতায় অভ্যস্ত তিনি, কিন্তু এমন

একটা সহজ আন্তরিকতা আছে তাঁর কথার সুরে ও চীৎকারে যাতে মনে হয় তিনি জনতার নেতা। রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত হয়ে থাকেন অবস্থাপন্ন, ইনি তা ন'ন। হয়তো তাঁর ধর্মভীরুতা এর একটা কারণ, হয়তো বা দরিদ্রের জন্য ত্যাগ করেছেন। ভারতের প্রতি সত্যিকারের দরদ এদেশে যদি কারো থেকে থাকে তো এঁর আছে। তিনি যে আমাদের কত নিকটে তার উদাহরণ স্বরূপ সোরেনসেন একবার এক মজার গল্প বলেন। পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশন-এর সঙ্গে ১৯৪৬ সালে ইনি যখন ভারতে গিয়েছিলেন তখন এক বাঙালী জ্যোতিষী অনেক গণনার পর তাঁকে জানায় যে গত জন্মে তাঁর নাম ছিল সুরেন সেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-জন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যা জানালেন তার অধিকাংশই সত্য নয়।

যে-ইংরেজ ভারতকে এতকাল আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, প্রাণপণে আঁকড়ে থেকেছে, সে কেন এত হঠাৎ ভারত ছেড়ে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং সত্যি সত্যিই ছেড়ে এল, একথা ভেবে অনেকেই অবাক হয়েছে। ইংরেজ গভর্মেণ্টের চিরাচরিত নীতির সত্যিকারের পরিবর্তন আসে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে,—পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশন যখন ফিরে এসে দাখিল করলে রিপোর্ট। এই দলে ছিলেন 'commoner' সোরেনসেন, অভিজাত লর্ড চোর্লি; লেবার, লিবার্ল ও

টোরি দলের লোক। ফিরে এসে এঁরা সবাই একবাক্যে বলেন, সমস্ত ভারত বসে' আছে আগ্নেয়গিরির উপর— যে-কোনো মুহূর্তে চতুর্দিকে আরম্ভ হবে দারুণ বিস্ফোরণ। অনতিবিলম্বে কিছু করা দরকার। অ্যাটলী দেখলেন 'এটা ১৯৩৯ নয়, ১৯৪২-ও নয়—এ ১৯৪৬'। অর্থাৎ চার বছর আগের তুলনায় শক্তিতে ইংরেজ এখন অনেক দুর্বল। কিন্তু নিতান্ত সরল সামরিক হিসাব অনুসারে দেখা যায় ভারতকে বেঁধে রাখতে হলে যে-পরিমাণ সৈন্য ও অর্থ প্রয়োজন তা তাদের নেই। সুতরাং মানে মানে সরে' পড়তে হবে, তাতে তবু কিছু সুবিধা হতে পারে ভবিষ্যতে। অতএব সত্যিকারের ক্ষমতা হস্তান্তর:করা সিদ্ধান্ত করে' পাঠানো হল ক্যাবিনেট মিশন। লেবার মন্ত্রীদের তারিফ করতে হয় ভারতপ্রীতির জন্য নয়, কোদালকে কোদাল বলে' চিনবার জন্য। চার্চিল সাহেব আজো কাঁদেন: বাপ-পিতামহর কষ্টার্জিত জমিদারি উচ্ছন্নে দিলে কতগুলি অক্ষম অর্বাচীন যাদের রোজগারের ক্ষমতা নেই, আছে ওড়াবার। তিনি হাল ধরে' থাকলে নৌকাটা ভারতের আগ্নেয়-গিরির গাএ যেয়ে ধাক্কা খেত সন্দেহ নেই এবং কী যে সর্বনাশ হত ভাবা যায় না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত এদেশে এমন লোক আছেন অতীত গৌরবের ভাবাবেগে যাদের চোখ এত ছলছল নয় যে সামনের বিপদও দেখতে পান না। পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশন-এর সদস্যদের ভাষণ শুনলে

সে-সত্য বুঝতে পারা যায়। ভারতের স্বাধীনতার দিন নির্ধারিত করেছেন এঁরা—বহু-প্রচারিত ক্যাবিনেট মিশন নয়।

জন বুল

আমার বন্ধু ফাউলার গেছে ভারতবর্ষে, সেখানে বসবাস করবে বলে'। ফাউলার বয়সে তরুণ, ভারত সম্বন্ধে তার অদম্য ঔৎসুক্য এবং মোহ। যুদ্ধের পরে একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রণয় হয়। সে ছিল কলকাতায় পাঁচ বছর,—যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে দেশে, বোধহয় বরের খোঁজে। কপালজোরে পেল ফাউলার-কে। এই মাস দশেক হল বিয়ে হয়েছে ওদের। তারপর মিসেস ফাউলার স্বামীকে নিয়ে ফিরে গেলেন সেই 'দুধ আর মধু'র দেশে।

ছেলেটি পড়ুয়া ধাতের। যাবার আগে কয়েকমাস ভারত সম্বন্ধে—বিশেষ করে' ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে—অনেক বই পড়ে' ফেললো। আর দেখা হলেই আমাকে জর্জরিত করতো নানা প্রশ্নে। সে সব প্রশ্নের উত্তর দে'য়া সর্বদা সহজ ছিল

না,—কিন্তু ফাউলার.ইতিমধ্যে ভারতকে মাতৃভূমি বলে' গ্রহণ করেছে মনে প্রাণে, সুতরাং আমার কথায় বিশেষ কিছু এসে যেত না।

কলকাতায় পৌঁছে সে চিঠি লিখলো। অনেক খুঁজে রিপন ষ্ট্রীটের কাছে অতি নোংরা এক গলিতে তিনখানা ঘর পেয়েছে, পাঁচ শো টাকা সেলামি দিয়ে। সমস্যা এখনো অনেক। চাকর বাকর বাগ মানে না। তাড়াতাড়ি একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে। ইতিমধ্যে তার নিজের দেশের লোকদের যতটুকু সে দেখেছে—জলপথে এবং স্থলে—তাতে সে যারপরনাই লজ্জিত। এরা বাস করে নিজেদের এক অতি-পবিত্র আলাদা জগতে, চার পাশের বিস্তীর্ণ জনস্রোতের থেকে সযত্নে ছোঁয়া বাঁচিয়ে। কী আশ্চর্য আত্মম্ভরিতা, কী উত্তুঙ্গ স্নবারি। ইংরেজ সাম্রাজ্য যে ধ্বংস হয়েছে ভারতে এ অতি সুখের কথা। তবে আশ্চর্য, স্বাধীনতার পরে এখনো দেখা যায় সওদাগরী ইংরেজদের আড্ডায় ক্লাবে ভারতীয়রা পাত্তা পায় না। এদের সঙ্গে সে কখনো মিশবে না। এই ভুয়ো সমাজের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও তীব্র নিন্দা করে' জ্বালাময় বিষে কলম ডুবিয়ে একখানা বই লিখছে সে, অ্যাটম-বোমার মত সেটা ফেলবে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মধ্যিখানে। তখন একটা মজা হবে বটে।

সে হয়তো ভেবেছিল আমি তার উৎসাহের আগুনে ইন্ধন

যোগাবো কিন্তু আসলে আমি বিরুদ্ধ উপদেশ দেবার লোভ সামলাতে পারি নি। লিখলাম, তোমার টাকাকড়ি খুব বেশী নেই, কোনো কাজের বিশেষজ্ঞও নও তুমি, ওখানে গেছ ভাল চাকরির আশা করে', আরামে বাস করবে বলে'। তা যদি চাও তো তোমার দেশী ভাইদের চটালে চলবে না। শুধু ভারতীয় বন্ধু নিয়ে তোমারও বোধহয় বেশীদিন ভাল লাগবে না।

এর উত্তরে কিছুদিন পরে যে-চিঠি এল তাতে তেজটা কিছু কম, সন্দেহের চিহ্ন আছে কিঞ্চিৎ। সে ভেবে দেখেছে আমার কথা, সেগুলো কিছু কিছু সমীচীন। পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে লাভ নেই। তবে বই সে লিখবেই, যা বলতে চায় তাও বলবে, কিন্তু অতটা বিষ ঢালবে না তাতে। আর, ছদ্মনাম দে'য়াই বোধহয় ভাল হবে। চাকরির যা বাজার! বড় বড় সাহেবদের তেল মেখেও কিছু হচ্ছে না। হাজার তো দূরের কথা, পাঁচশো পেলেই সে নিয়ে নেয়। কিন্তু তাবলে ভারত সে ছাড়বে না, তার প্রতিজ্ঞা এখনো আগের মতই দৃঢ়।

এর প্রায় তিন মাসের মধ্যে ওদের আর কোনো খবর নেই। তারপর হঠাৎ এক সকালে টেলিফোনে শুনলাম ফাউলার-এর কণ্ঠস্বর: আজ দুপুরে আমি তার সঙ্গে লাঞ্চ্ খাবো কি? ভিক্টোরিয়া-তে সেই আমাদের পুরনো পোলিশ

রেস্তরাঁতে। ঠিক সাড়ে বারোটায়। অনেক কথা আছে।

বেশ খানিকটা ঔৎসুক্য নিয়ে হাজির হলাম। ঢুকে দেখি রাস্তার ধারে কাঁচের জানলার পাশে বসে' আছে ফাউলার। একটু মোটা হয়েছে, রং পুড়েছে বেশ খানিকটা। এক গাল হেসে অভ্যর্থনা করলে আমাকে, বললে, 'আগে এসে আমাদের প্রিয় কোণটি দখল করেছি, আর একটু পরেই তো ভীড় বাড়তে আরম্ভ করবে। সব মনে আছে আমার। তারপর কী খাওয়া যায়,—মক্ টার্ট্‌ল স্যূপ চলতে পারে এবং—আহা-হা সেই আমাদের হাঙ্গেয়ারিয়ান গূলাশ—ওটা খেতেই হবে, তার সঙ্গে পালং শাক আর দলানো আলু, কী বল। And a pint of Lager to wash it down। আরে, আমাদের good old সনিয়া সুন্দরী আজো পরিবেশন করে' চলেছে দেখছি। আ—আঃ, লণ্ডনের হাওয়া কী মিষ্টি! কে বলে আমাদের দেশটা খারাপ।'

ওর দুর্বার উচ্ছ্বাসকে আস্তে আস্তে বাগ মানিয়ে অবশেষে যা জানলাম তা হচ্ছে এ-ই। চাকরি সে শেষ পর্যন্ত পেল না, টাকা গেল ফুরিয়ে। সমস্যাগুলি এদিকে বেড়ে চললো দিনে দিনে,—অনেক মাইনে দিতে হয় চাকরদের, তাও তারা ঔদ্ধত্য দেখায়, চুরি করে; জিনিসপত্রের দাম আগুন। এদিকে জুন মাসের আকাশ থেকে আগুন বৃষ্টি। স্ত্রী বললে দেশটা যেমন ছিল তেমন আর মোটেও নেই, জীবনযাত্রা এখন অনেক

কঠিন। সেও বুঝে দেখলো, ভারতে ইংরেজের' দিন ফুরিয়েছে—ওখানে তার ভবিষ্যৎ বড়জোর আর বছর কয়েক। কিন্তু সে সবে নতুন করে' জীবন শুরু করছে, তাকে ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে। সে ঠিক করেছে এখানে শিখবে জার্নালিজ্‌ম।

এক টুকরো ঝোলমাখা মাংস মুখে তুলতে তুলতে যথাসম্ভব নিস্পৃহ সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর তোমার সেই বই কী হল ?'

'এখনো লিখছি,' ফাউলার বললে, 'ভেবে দেখলাম ওটা এদেশে ছাপানো অনেক ভাল। এখানকার লোকের চোখ খুলবে ভারতবাসী ইংরেজ সম্বন্ধে। তুমি কী বল ?'

কী আর বলবো! ও-তথ্য অনেকে পরিবেশন করেছে আজ পর্যন্ত। এই সেদিন Penderel Moon লিখেছেন তার Strangers in India। ইংরেজ ভারতে আর ইংরেজ স্বদেশে এই দুইএর মধ্যে যে অনেকখানি দূরত্ব এ-সত্য বহু উচ্চারণে এখন ছিন্নপ্রায়, কিন্তু আজো সত্য আগের মতই। এই সেদিন এক পাব-এ আলাপ হয়েছিল জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস.-এর সঙ্গে। নয়াদিল্লীর দপ্তরে বহুকাল ছিলেন, অবশেষে বাণিজ্য বিভাগের শিখরের কাছাকাছি উঠেছিলেন। অতি অমায়িক ভদ্রলোক ; বীয়ার-এর গ্লাস হাতে নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা আলাপ হল ; ভারত সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ভাবছিলাম, দেশে যদি দৈবক্রমে এমনি

সামাজিক সূত্রে পরিচয় হত তার সঙ্গে তবে ক'টা কথা তিনি বলতেন। আর বললেও তার মধ্যে থাকতো অনেকখানি দূরত্ব এবং শৈতল্য।

ফাউলার-এর মত যারা যায় এখান থেকে, প্রথমে তাদের মনে লাগে রূঢ় অপ্রীতিকর আঘাত। তেমনি আমরা যারা আসি ভারত থেকে ইংলণ্ডে তাদের প্রথম অভিজ্ঞতায় থাকে সুখকর বিস্ময়।

সবচেয়ে ভাল লাগে অপরকে সাহায্য করার আগ্রহ। রাস্তায় বাজারে রেস্তরাঁয় রেল-স্টেশনে সর্বত্র। বিশেষ করে' আমাদের মত বিদেশী অতিথিদের প্রতি এ-বিষয়ে সচেতনতা এদের বেশী। পথের নির্দেশ জিজ্ঞাসা করলে কখনো কখনো উল্টো দিকের পথিক পৌঁছে দিয়ে যায়। একবার ওএলস-এ এক বাস্-ইনস্পেক্টর যা করেছিলেন তা কোনোদিন ভুলবো না। কার্নার্ভন শহর থেকে যাব বেশ কিছু দূরে লান্বেরিস গ্রামে (Llanberis—ওএলসীয় উচ্চারণ খ্লানবেরিস), সেখানে ট্রেনে চড়বো ইংলণ্ড ও ওএল্স-এর সর্বোচ্চ পাহাড় (৩,৬০০ ফুট) স্নোডন-এর শিখর লক্ষ করে'। এই রকম ইচ্ছা ছিল মনে। কিন্তু দেখা গেল নিয়মিত বাস্টা গেছে ভরে', আর লোক নেবে না। উপরোক্ত ভদ্রলোকটি তখন গারাজ-এ টেলিফোন করে' আনালেন আরেকটি বাস্—শুধু আমাদের তিনটি ভারতীয়ের জন্য।

ভারতীয় বা বিদেশী বলে' যেমন খাতির পাওয়া যায়, কখনো কখনো আবার তেমনি অপ্রস্তুতেও পড়তে হয়। কারো দিকে হাঁ করে' তাকিয়ে থাকা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, এ-নীতি এরা এত বেশী রকম মানে যে কারো কপালের মধ্যিখানে যদি এক তৃতীয় চোখ থাকে তবু সেদিকে আলগোছে একবার চেয়েই অধিকাংশই লোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু কোনো কোনো গেঁয়ো আনাড়ীর মনে সভ্যতার কৃত্রিম অনুশাসন হার মানে আদিম কৌতূহলবৃত্তির কাছে। তাছাড়া শিশুরা তো আছেই ; ট্রেনে বাসে হয়তো মাকে ডেকে বলবে : মা দেখ দেখ, একটা কালো আদমী ! মা-বেচারার মুখ লাল হয়ে ওঠে, ফিস ফিস করে' ধমক দেয়, বেশী নজরে পড়ে' গেলে বিদেশীর কাছে ক্ষমা চায় সন্তানের হয়ে। বাচ্চা তো বুঝতে পারে না কী মহাভারত অশুদ্ধ হল এতে ; সেবারে চিড়িয়াখানায় যেয়ে যখন প্রত্যেক খাঁচার সামনে এমনি আগ্রহে মা'কে ডেকে ডেকে দেখিয়েছিল, তখন তো মা'রও উৎসাহ কম ছিল না !

দূর পল্লী অঞ্চলের লোক মাঝে মাঝে দেখা যায় যারা কিছুটা ভয় পায় আমাদের দেখে। বোঝা যায় ভারতীয় এরা বড় একটা দেখে নি। দূর থেকে দেখে ভাবে এরা আবার কোত্থেকে এল রে বাবা ! ওএল্‌স দেশটা ইংলণ্ডের মত এতটা 'আলোকপ্রাপ্ত' নয়, কিন্তু তার উত্তরাংশের প্রাকৃতিক সম্পদ অতি সুন্দর। পাহাড় নদী বন হ্রদ ইত্যাদির মধ্যে

মধ্যে ছোট ছোট ঘুমন্ত গ্রামগুলি বড় মনোরম। কিন্তু ভ্রমণেচ্ছু ভারতীয় পাণ্ডবরা সাধারণত এসব জায়গা বর্জন করেন। তাই হোটেলের কর্ত্রীরা দরজা খুলেই চমকে' ওঠেন, জায়গা থাকলেও বলেন নেই। এই রকম একটা জায়গায় একবার অতি কষ্টে মাথা গলিয়ে তারপর আস্তে আস্তে ভয় ভাঙানো গেল গৃহকর্ত্রীর এবং তার সযত্নে-আগলানো ছেলে-মেয়েদের। জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন তো আমার দেশ কোথায় ? স্পেইন, পর্টুগাল থেকে ইরান, ইরাক পর্যন্ত অনেক দেশের নাম করলেন, ভারতের নাম মনে এল না। অনেকে আছে যারা ভারতীয় বলে' চিনতে পারে, সেজন্যই দূরে সরে' যায় আরো। স্কটল্যাণ্ডবাসী এক বন্ধুর কাছে গল্প শুনেছি, এক ছোট রেস্তরাঁয় খেতে যেতেন মাঝে মাঝে, সেখানকার পরিবেশিকাটি ভয়ানক ভয় করতো তাকে। কম্পিত হাতে খাবারের থালা সামনে বসিয়ে তাড়াতাড়ি পালাতো। অবশেষে অনেকদিন তার মধ্যে হিংস্রতার কোনো লক্ষণ না-দেখে বোধহয় মেয়েটির মনে একটুখানি সাহস ফিরে এল ; তখন তাকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল, তার ধারণা ভারতীয়দের কাছে সর্বদা প্রকাণ্ড এক ছুরি থাকে, পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষে নেই, ছুরি চালিয়ে দেবে।

নিছক চামড়ার কালো রঙের প্রতি যে-বিদ্বেষ তার প্রকাশ বড় একটা দেখা যায় না। অবশ্য মনে মনে যে কোনো

সংস্কার নেই এমন কথা জোর করে' বলতে পারি না। ওর সঙ্গে তুলনীয় সংস্কার আমাদের মনেও আছে—আছে সব জাতির মনে। তারই মধ্যে তারা সভ্য যারা ভাবে এবং ভাষায় সংযম করে লজ্জাকর প্রবৃত্তিকে। কারো কারো মনে কুসংস্কার সহজে দমে না, মাঝে মাঝে কাগজে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার পরিচিত দু'টি ভারতীয় ছাত্রকে একবার এক আশ্রয় ছেড়ে চলে' আসতে হয়েছিল তার কারণ তারা বাড়িতে থাকায় গৃহকর্ত্রী আরেকটা ঘর ভাড়া দিতে পারছিলেন না। কিন্তু সব দিক বিচার করে' একথা মানতেই হবে যে ভারতীয়দের প্রতি সাধারণ লোকের ব্যবহারে সদাসর্বদা অমায়িকতা এবং সাহায্য করবার আগ্রহই প্রকাশ পায়।

এদের নিয়মানুবর্তিতা, ব্যক্তিগত সততা, অন্যের সুখ-সুবিধার প্রতি বিবেচনা ইত্যাদির কথা ছোটবেলায় অবশ্য বইএ পড়েছি, কিন্তু এখানে এসে চোখে দেখে দুঃখ হয় নিজের দেশের কথা ভেবে। এখানে কেউ রাস্তায় থুথু ফেলে না; কাগজের টুকরো বা ফলের খোসা ফেলে তার জন্য নির্দিষ্ট টুকরিতে। এখানকার সিনেমায় একবার পয়সা দিয়ে ঢুকে চক্রগতি ছবি অনেকবার দেখা সম্ভব; রাস্তায় রাস্তায় টেলিফোন-খুপরির থেকে খুলে নে'য়া সম্ভব যন্ত্রটি; রাজপথের উপর স্তূপীকৃত খবর-কাগজ এবং তার বিক্রি-লব্ধ যে-পয়সা পড়ে' থাকে মালিকের চোখের আড়ালে, চুরি করা কঠিন

নয় তার থেকে। কিন্তু হয় না এর কোনোটাই। পূর্বোক্ত আরো অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মত ইংরেজদের এই গুণগুলিও পাশ্চাত্য জগতের অন্যান্য দেশের মধ্যে লক্ষ করা যায়; প্রাক্-যুদ্ধ য়োরোপের কথা জানি না, কিন্তু বর্তমানে অনেক য়োরোপীয় জাতি এ-বিষয়ে ইংরেজের কাছে হার মানবে।

আমাদের নানাবিধ দুর্গতির জন্য ইংরেজ দায়ী তা জানি। যে লোক খেতে পায় না তাকে চুরির দুর্নীতি বোঝানো কঠিন; নিরক্ষরতার শুষ্ক জমিতে জন্মে না সংস্কৃতির শস্য; স্বাস্থ্যহীন দুর্বল দেহে মস্তিষ্ক শিথিল, প্রাণটা সাবধানী এবং ভীরু। ইংরেজ আমাদের দরিদ্র, নিরক্ষর, স্বাস্থ্যহীন করে' ফেলেছে। কিন্তু আমাদের দোষের মূলে কি নিজেদের দায়িত্ব কিছু নেই,—সব গলদই কি অভাব-প্রসূত! তা যদি হয় তবে দেখি কেন যার আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ডিগ্রি তিনিও বাসে অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও সামনের লোককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজে আগে ওঠেন; যার অনেক টাকা আছে তিনিও মনে করেন ধারের টাকা শোধ করা নির্বুদ্ধিতা; প্রয়োজন না-থাকলেও সুবিধে পেলে ঘুষ না-নে'য়াটা অনেকের চোখে—যদিও মুখে কদাপি নয়—হাস্যকর কাপুরুষতা।

আর ভাল লাগে এদের কাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান।

কাজের পরিবর্তে পয়সা নিচ্ছি সুতরাং তার দাম চুকিয়ে দিতে হবে আর কিছু না-হ'ক নিজেরই আত্মসম্মানের খাতিরে এ জ্ঞানটা আছে অনেকেরই—তা সে আপিশের বেয়ারাই হ'ক আর তার সবচেয়ে বড় মনিবই হ'ক। আমরা ফাঁকতালে কাজ সারি বড় বেশী। কোনো রকমে দশটা থেকে পাঁচটা কাটিয়ে দে'য়া উদ্দেশ্য। নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার তাগিদটাই সবচেয়ে বড়; মাইনে বাড়ানো, শালাকে চাকরিতে ঢোকানো, ইত্যাদি। এতকাল বলেছি, বিদেশী গভর্মেণ্টের জন্য খেটে মরবো কেন? আজ স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু এখনো আমরা ফাঁকতালে কাজ গুছিয়ে নিতেই ব্যস্ত। এতকাল ভারতের 'গৌরবময় অতীত'-এর চর্বিত চর্বণ করে' এবং ইংরেজকে গালি দিয়ে আলস্যের সঙ্গে আত্মসম্মানও বজায় রেখেছি, তারপর সাম্প্রদায়িকতা আসাতে ও-জিনিসটার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে হাত গুটিয়ে বসে' থেকেছি। খুব সম্প্রতি এসেছে প্রাদেশিকতা। এতে, বিশেষ করে' আমাদের বাঙালীদের, হয়েছে খুব সুবিধে। আমাদের চতুর্দিকে শত্রু —বিহার, আসাম, উড়িষ্যা। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দেখতে পারে না। সুতরাং আমরা যে কিছু করতে পারছি না সেটা আমাদের দোষে নয়।

ইন্‌টেলেক্‌চুআল নামে যারা খ্যাত, তারাও অনেকে কাজ গুছিয়েই কাটালেন সারা জীবন। ধর, চল্লিশ বছর আগের

কোনো তরুণ বৈজ্ঞানিক, যার কাজের ঔজ্জ্বল্য আকর্ষণ করলে পৃথিবীর সুধী সমাজকে। পাশ্চাত্য জগত চেয়ে রইলো তার দিকে, কিন্তু ক্রমশ তিনি নিজেকে ছেড়ে দিলেন কাজ গুছিয়ে নেবার সাধনায়। গভর্মেণ্টের খেতাব, বড় চাকরি, তারপর নিজের ল্যাবরেটরি-র জন্য অমুকের চেয়ে বেশী টাকার বরাদ্দ আদায় করা, বেশী দামী যন্ত্র কেনা, বেশী সহকারীর ব্যবস্থা করা, সরকারী পরিষদের সদস্য হয়ে পৃথিবী ঘুরে আসা—এই করতে করতেই দিন গেল। 'চল দিল্লী'—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র। অমুককে লাঞ্চ-এ নিমন্ত্রণ করা, অমুকের বৈঠকখানায় ধন্না দে'য়া এসব করে' যেটুকু সময় থাকে তা গেল কাগজ সই করতে করতে। ল্যাবরেটরি-র দিকে যাবার বা গবেষণার বিষয়ে ভাববার সময় কোথায়। সুতরাং, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক জগত চেয়েই রইলো। তা থাক, দেশের লোকে তো জানে সে কত বড় ব্যক্তি। অন্তত অমুকের চেয়ে তো বড়!

কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আছেন তারা থাকেন নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশের মধ্যে জ্ঞানের জগতে,—তবু তাদের ক'জন কাজে লাগান গবেষণার সুযোগ। এদেশের অধ্যাপকদের জীবনে অধ্যাপনার চেয়ে অনুশীলনের অংশটাই প্রধান। গভর্মেণ্টের ডাক এড়াতে ব্যস্ত তারা অনেক সময়ে, গবেষণার আকর্ষণে। অনেক চুল-পাকা বুড়ো বৈজ্ঞানিক আছেন, যাদের দেহে শক্তি নেই তেমন, নিচে আছে বহু

সহকারী, তবু তারা আজো নিজের হাতে কাজ করে' চলেছেন। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভাগে বিভাগে দলাদলির চেয়ে সহযোগিতা অনেক বেশী থাকায় আমাদের তুলনায় কাজ এগিয়ে যায় দ্রুতবেগে।

ফাঁকতালে সুবিধে পাবার চেষ্টা, বিনাপ্রয়াসে লাভের আগ্রহ আমাদের মধ্যে বড় বেশী। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একটিই, তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে কথায় বা লেখায় আমাদের কার্পণ্য নেই, কিন্তু চাঁদার খাতাকে এড়িয়ে চলি। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা আজ পর্যন্ত উঠলো না: এদেশে রুজভেল্ট-স্মৃতিভাণ্ডারের নির্ধারিত টাকা মাত্র ক'দিনে উঠে গেল, এবং যাতে সবাই দেবার সুযোগ পায় সেজন্য নিয়ম করে' দিতে হল পাঁচ শিলিং-এর বেশী কেউ দিতে পারবে না। রুজভেল্ট এদের কাছে বিদেশী লোক, রবীন্দ্রনাথ আমাদের আপন—এবং শতাব্দীর একজন।

অথচ এমন মজা, ধর্মের মাদকতা যখন আমাদের পেয়ে বসে তখন অনেক সহজে পয়সা ছড়াই আমরা। পরকালের ভালর জন্য গড়ি মঠ এবং মন্দির, অমুক তীর্থস্থানে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বাঁধিয়ে দিই, তমুক জায়গায় করি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। ইতিমধ্যে ইহকালের দৈনন্দিন জীবনে চলতে থাকে লোভের চরিতার্থতা। আমাদের গর্ব আমরা ধর্মপ্রাণ জাত। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু মনে প্রাণে ধার্মিক নই আমরা—শুধুমাত্র

ধর্মালু,' ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ লাভের পন্থী। ধর্ম আশ্রয় নয়, ধর্ম আমাদের বিলাস।

কফি খাচ্ছি এমন সময়ে বিল নিয়ে এল সনিয়া। ছুটো-ছুটির মধ্যে একটুখানি বুঝি অবসর পেয়েছে, ফাউলার-এর দিকে চেয়ে বললে, 'তারপর আমার জন্য কী এনেছ ভারতবর্ষ থেকে ?'

'এনেছি এক প্রকাণ্ড শ্বেত-হস্তী,' ফাউলার বললে, 'জিনিসটা একটু বড় বলে' আজ সঙ্গে আনতে পারি নি। আপাতত এটুকুতেই খুশী হতে হবে তোমাকে।' বলে' ওর দিকে বাড়িয়ে দিলে এক অর্ধ-ক্রাউন।

খুশী সে হল সন্দেহ নেই, চোখ বিস্ফারিত করে' হাসলো। তারপর বললে, 'এই না যাচ্ছ ভারতবাসী হবে বলে', হঠাৎ ফিরে এলে যে! ইংরেজরাও কি ঘর-কুনো হয়ে উঠছে নাকি, তাহলে সাম্রাজ্যের holy burden বইবে কে ?'

'এখন শুধু ভারটাই আছে, তার পবিত্রতা আর নেই। তাছাড়া ওরা আমায় বললে : ভারত ছাড়।'

'তাই নাকি! কী ভয়ানক!' চোখ কপালে তুলে সনিয়া আমার দিকে তাকালো।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তা বলে তুমি ভয় করো না— তোমাকে কখনো আমরা ওকথা বলবো না।'

পরম আশ্বস্ত হয়ে সনিয়া বললে, 'বাঁচা গেল ; ভেবেছিলাম ভারতে বুঝি আর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। পৃথিবীতে দুটি মাত্র সুন্দর দেশ—পোলাণ্ড আর ভারত। এই হতভাগা দেশে মানুষে বাস করে—দেখ না একবার আকাশের চেহারা! এইরে আমার টেবিলে নতুন লোক এসেছে, তাকাচ্ছে কটমটিয়ে। পালাই।'

ফাউলার বললে, 'আচ্ছা বিদেশীরা সর্বদা আমাদের দেশের আবহাওয়ার নিন্দে করে কেন বল তো?'

স্বর নামিয়ে বললাম, 'গোপনে বলি তোমাকে, ওটা হিংসে ছাড়া কিছু নয়।'

খুব খানিকটা হাসলো সে। 'না, সত্যিই আমাদের আকাশটা পচা,' বলে' বাইরের ভেজা রাস্তাটার দিকে চেয়ে সযত্নে পাইপ-এ আগুন লাগালো। 'কিন্তু এখানে অন্য একটা আবহাওয়া আছে—মনের, স্বভাবের—যেটা মুক্ত এবং সহজ। পথে চলতে, লোকের সঙ্গে যোগাযোগে প্রতিদিন প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মতই এ-জিনিসটা অনুভব করা যায়। উপযুক্ত নামের অভাবে, সামাজিক গণতন্ত্র বলতে পার একে। বিদেশে যেয়ে বুঝতে পেরেছি আমাদের এ-জিনিসটার মাহাত্ম্য। কিছু মনে করো না, কিন্তু ভারতে শ্রেণীভেদ বড় বেশী ঠেকলো আমার চোখে। অর্থ বা জ্ঞানের মর্যাদায় ছোট বড় আছে ইংলণ্ডেও, কিন্তু এখানে ব্যবহারে ততটা প্রকাশ পায় না সেটা।

আমার. মনে হয়, ইংলণ্ড এ-বিষয়ে আমেরিকাকে এবং য়োরোপের অনেক দেশকে হার মানাবে।’

মনে পড়লো কাগজে ছবি দেখেছিলাম ভারত-সচীব লর্ড পেথিক-লরেন্স মাছের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সারি-বাঁধা অনেক লোকের পিছনে। চা এর সারিতে কলেজের প্রোফেসর দাঁড়ান ছাত্রদের পিছনে, আপিশের উঁচু কর্তা নিচু সহকারীদের পশ্চাতে। এদেশেও আছে চাকর কুলি মজুর বাস্-কণ্ডাক্টার ওয়েট্রেস ইত্যাদি নিচু স্তরের লোক, লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড-এ নোংরা বস্তিতে আছে অনেক গরিব পরিবার,—কিন্তু তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলে না, মর্যাদা দিতে হয়। মুটেকে বলতে হবে : আমার মালটা নেবে কি ? চাকরকে গালাগালি করে’ দু’ঘা বসিয়ে দে’য়া এখানে চলবে না।

তাছাড়া আর্থিক ভেদাভেদ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক সংকীর্ণ। আমাদের আপিশে বড় কর্তার মাইনে তার বেয়ারার চেয়ে একশো গুণ কি তারও বেশী। এমনটি বোধহয় আর কোনো দেশে নেই।

গণতন্ত্রের মুক্ত হাওয়া এখানে নানা দিক থেকে টের পাওয়া যায় সমাজে এবং রাজনীতিতে। সরকারীভাবে বাজেট প্রকাশ করবার ঘণ্টাখানেক আগে খবর-কাগজের লোকের কাছে ভিতরের তথ্য সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিতে জানিয়ে-

ছিলেন ডাঃ ডল্টন, এই সামান্য অবিবেচনার জন্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন তিনি অনুচ্চারিত গণমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে। (মনে পড়ে আমাদের একাধিক নেতার কথা যারা এর চেয়ে অনেক বেশী লজ্জাকর অবস্থার মধ্যে মন্ত্রিত্ব আঁকড়ে ধরে' থেকেছেন।)

সাধারণ ইংরেজ স্বভাবত রক্ষণশীল। এমনকি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে চার্চিল-পন্থীর সংখ্যা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। রাজ-পরিবারের নামে এদের চোখ বুঁজে আসে ভক্তিতে, কথা জড়িয়ে যায় উচ্ছ্বাসে। রাজকুমারীর বিয়েতে কিংবা রাজা-রানীর বিয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবে লণ্ডনের রাস্তায় যে উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে গেছে তার স্রোতের মধ্যে পড়লে বিদেশীরা অবাক হয় এদের 'নাবালকত্ব' দেখে। পৌরাণিক জাঁকজমক, ঘটা এবং ঠাট ইত্যাদির প্রতি এদের আশ্চর্য আকর্ষণ। মনে আছে, অনেকদিন আগে এক দলের সঙ্গে পড়ে' ছুটতে হয়েছিল লর্ড মেয়ার-এর মিছিল দেখতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক দৌড়ে, বাসে সুরঙ্গপথে ঘুরে ঘুরে অবশেষে যখন পা টনটন করছে এবং নভেম্বরের শীতেও ঘামছে সারাদেহ তখন এসে পৌঁছানো গেল লাড্‌গেট সার্কাস-এ। বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে লোকের মাথার ফাঁকে ফাঁকে মিছিলের এক দশমাংশও দেখা গেল না—কিন্তু তাইতেই লোকের কী আনন্দ! সিনেমার ঘরে বসে' পরিপূর্ণ দৈহিক আরাম

সহযোগে এ-জিনিসই অনেক ভাল দেখা যাবে, যেমন দেখা গেছে রাজকন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে (এবং এত বারে বারে যে অবশেষে কিছুদিনের জন্য সিনেমায় যাওয়া বন্ধ করতে হল)। তবু সে-সময়েও আগের দিন থেকে লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে মিছিলের মধ্যে কনে-রাজকন্যার গাড়িটা চর্মচক্ষে দেখবে বলে'।

এই মজ্জাগত রক্ষণশীলতা এবং সনাতনী ধাত সত্ত্বেও এদের অন্তর্নিহিত সাম্যবোধ তাই আরো আশ্চর্যজনক। রাজনীতির ক্ষেত্রে এদেশে যতটা সোশালিজ্‌ম হয়েছে, রাশ্যা এবং তদ্‌সংলগ্ন কম্যুনিস্ট দেশগুলি ছাড়া আর কোথাও এতটা সম্ভব হয়নি। লেবার গভর্মেণ্ট ন্যাশনালাইজেশান-এর পথে যতটা অগ্রসর হয়েছে অনেকেই ভাবে নি যে এতটা তারা করতে চাইবে বা চাইলেও সাহস করবে। নতুন 'সোশাল সিকিয়রিটি' পরিকল্পনা রোগ বেকারত্ব অনাহারের চির-পরিচিত বিভীষিকার বিরুদ্ধে দেশের প্রতিটি লোকের রক্ষাকবচ—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। যুদ্ধের পর এই তিন বছরে এদের সমাজ সাম্যের দিকে অনেকখানি এগিয়েছে। কিন্তু তার জন্য সবটুকু কৃতিত্ব বর্তমান গভর্মেণ্টের নয়, কারণ এটা সম্ভব হয়েছে সাধারণ ইংরেজের চরিত্রে অন্তর্নিহিত সাম্য-প্রীতির গুণে। এই বৈশিষ্ট্য আছে ছোট বড়, লেবার টোরি সবার মধ্যেই। সেজন্যই দেখা গেছে লর্ড পেথিক-

লরেন্স-কে মাছের দোকানের সারিতে। এই একই ইংরেজ দিল্লী কলকাতায় কেমন জটিল জাতিভেদের সৃষ্টি করেছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সেখানে তার মাথায় চড়েছিল ঝাঁজালো ঔপনিবেশিক নেশা,—আর নেশার প্রভাবে মানুষের চরিত্র অদ্ভুত বদলে' যায় সবাই জানে।

আমেরিকা কথায় কথায় গণতন্ত্রের বড়াই করে। তার কারণ তাদের constitution-এ লিখিত আছে : সব মানুষ সমান হয়ে জন্মায়।···কিন্তু কলমে যা সম্ভব হয়েছে কাজে তার দিকে কোনো চেষ্টাও হয়নি। আজো সেদেশে অধিকাংশ নিগ্রো-র ভোট নেই, কোথাও কোথাও তাদের যেতে হয় আলাদা স্কুলে কলেজে। আজো সেখানে পুলিশের নাকের উপর নিগ্রোদের 'লিঞ্চ্' করা হয়, আততায়ীরা খালাস পেয়ে যায় আদালতের বিচারে।

১৯৪৭ সালের এক কাহিনী বলি। উইলি আর্ল নামে এক নিগ্রোকে সরকারী জেল থেকে বা'র করে' নিয়ে অনেক-গুলি সশস্ত্র বীর শ্বেতাঙ্গ মারতে মারতে খুন করলে। একত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হল, তাদের মধ্যে ছাব্বিশ জন লিখিত স্বীকৃতি দিয়ে দোষ মেনে নিলে। ন'দিন ধরে' বিচার চললো, অবশেষে জজ শ্বেতাঙ্গ জুরি-কে অনুরোধ করলেন তাদের অভিমত জানাতে, মনে করিয়ে দিলেন আইনের চোখে বর্ণভেদ নেই। সিদ্ধান্তে আসতে জুরি-ব্যক্তিদের বেশীক্ষণ লাগলো

না, সবাই একবাক্যে বললে, ওরা নিরপরাধ। জজ হুকুম দিলেন খালাসের। 'নিরপরাধ'দের উল্লসিত চীৎকারে আদালত ধ্বনিত হল। উইলি-র মাথার খুলি ভেঙেছিল যে-ব্যক্তি (ন'জনের স্বীকৃতি অনুসারে), শোনা গেল তার চীৎকার : 'জীবনে এত ভাল বোধ করি নি এর আগে। ন্যায় বিচার পেয়েছি আমি। এখন একমাস মাতাল হয়ে পড়ে' থাকবো, তারপর শেরিফ হতে চেষ্টা করবো।'

জুরি-র লোকদের ভয় ছিল তারা একঘরে হতে পারেন,—এবং সেটা হয়তো সম্পূর্ণ অহিংসভাবে নাও হতে পারে,—সুতরাং 'ন্যায় বিচার' না-করে' তাদের উপায় কি! তারা না-হয় ছা-পোষা লোক। উইলি-র মা গভর্মেণ্টের কাছে আবেদন জানালেন ৫০০ পাইণ্ড-এর জন্য,—লিঞ্চ্ করে' যাদের মারা হয় তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। সরকার জানালেন, ওকে যে লিঞ্চ্ করে' মারা হয়েছে তার কোনো আইন-সঙ্গত প্রমাণ নেই।…দরকার হলে বোধহয় এও বলা চলতো, উইলি যে মরেছে তারই কোনো প্রমাণ নেই।

যুক্তপ্রদেশের নির্বাচিত গভর্ণর ডাঃ বিধান রায় এই সেদিন খেতে ঢুকেছিলেন আমেরিকার এক রেস্তরাঁতে। গাএর রং কালো বলে' তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। আসবার আগে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'তোমাদের দেশেও জাতিভেদ

আছে দেখছি।' সাদা চামড়ার মধ্যেও আছে ভেদাভেদ,—অনেক জায়গায় ইহুদীরা আপাঙক্তেয়, সরকারীভাবে না-হলেও গোপনে। এও এক রকম ধর্মমূলক সাম্প্রদায়িকতা,—কিন্তু আমাদের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার জন্য কত বক্তৃতা উপদেশ ব্যঙ্গোক্তি শুনতে হয় আমেরিকা-র থেকে!

মার্কিন জগতে গণতান্ত্রিকতার আরো নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে Committee on un-American Activities-এর কার্যকলাপে। বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সরকারী চাকুরে ইত্যাদি সব রকম লোকের অনুসন্ধানে এবং বিশুদ্ধীকরণে এরা অতি-মাত্রায় ব্যস্ত। হলিউড-এর কোনো চলচ্চিত্রে যদি থাকে গরিবের উদ্দেশ্যে এক ফোঁটা চোখের জল, অমনি ধরে' নে'য়া হল যে লেখক নিশ্চয় কম্যুনিস্ট। লেখককে কিন্তু তার বক্তব্য বলবার অনুমতি দে'য়া হল না, স্টুডিও-র কর্তার কাছে হুকুম হল—ওর চাকরি খতম কর। বাছা বাছা কয়েকটি অভিনেতা নাবালকের মত উচ্ছ্বাসপূর্ণ যে কতগুলি কথা বললেন নাটকীয় ভঙ্গিতে, তা-ই ধরা হল বিরুদ্ধ প্রমাণ বলে'। দর্শকরা খুব হাততালি দিলে, পাঠকরা বাহবা দিলে। আহা তাদের বব্ টেলর বা বব্ মণ্ট্গোমারি যা বলবে তার উপর আর কোনো কথা থাকতে পারে!

য়োরোপের ডিক্টেটর-দের হাত থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন বহু বৈজ্ঞানিক আমেরিকাতে। তাদের চেষ্টায়

সফল হয়েছে অ্যাটম-বোমা; বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমেরিকার মর্যাদা বেড়েছে অনেকখানি। এঁদের মধ্যে যারা সরকারী চাকরিতে আছেন তাদের সম্বন্ধে চলছে আনুবীক্ষনিক পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহির অনুষ্ঠান। 'অ-মার্কিনতা' থাকলে চলবে না। দেশদ্রোহিতার প্রমাণ অনেক স্থলেই কাল্পনিক। বিজ্ঞানের শ্বাস স্বাধীনতা। আমেরিকায় আজ অনেক বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় বার ফাঁপরে পড়বার ভয় করছেন।

এর তুলনায় ইংলণ্ড কার্যত যে বেশী গণতান্ত্রিক শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে সে বহুদিন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। ঐটুকু দেশে আজ পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ এসেছে ছত্রিশবার।* যদিও এই দুর্দিনে এখন এদের নেই সব রকম যন্ত্রপাতি এবং মালমশলা, এবং অনেকক্ষেত্রেই জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চলে, তবু আজো বিজ্ঞানের নানা আশ্চর্য আবিষ্কার ঘটছে ইংলণ্ডে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি কমে নি এতটুকু। পাশ্চাত্য জগতে আমেরিকা আজ সব-পেয়েছির দেশ, ইংলণ্ড প্রায় সব-হারানোর দেশ। সুতরাং আমেরিকার সুবিধা অনেকখানি। সেজন্য ইংলণ্ড আবিষ্কার করলো পেনিসিলিন, কিন্তু আজ তার ৯৫% তৈরি হচ্ছে অতলান্তিক-পারের কারখানায়। সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমেরিকা

* ১৯৪৮ সালে আরো দু'টি।

ছিল নাবালক। ইংলণ্ডের মত এতটুকু ছোট দেশে এতগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি এবং সাহিত্যিকের জন্ম যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এরা গর্ব করতে পারে বই কি।

দেশটা ছোট কিন্তু তা'বলে অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত বা অন্যান্য পার্থক্যের অভাব নেই। অনেক সময়ে এক কাউন্টি থেকে পাশের কাউন্টি-তে গেলে শুনতে পাওয়া যায় ভিন্ন সুরের কথাবার্তা। দক্ষিণের সারে ভাষায় এবং অভ্যাসে অনেকটা বিভিন্ন উত্তরে ইয়র্কশায়ার-এর থেকে। স্কটল্যাণ্ড-ইংলণ্ডে বা ওএল্স-ইংলণ্ডে তো কথাই নেই। ঐ খণ্ডগুলির মধ্যে আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনও আছে। ওএল্সীয়রা ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী, আজ বিদেশী-বংশ-ধরদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের 'জাতীয়' পোশাক এবং উৎসব ইত্যাদি বিভিন্ন, ভাষা মূলত আলাদা। আড়ালে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশ করে' থাকে ওদের অনেকে। ইংরেজরাও ওদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অনেকটা—যেমন করে শহুরে বড়লোক তার গরিব গেঁয়ো আত্মীয়কে।

এত রকমের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমস্ত দ্বীপটা মিলে মিশে বাস করছে, একে অন্যের গলা কাটছে না। লণ্ডনের খবর-কাগজ বলছে না ওএল্স-বাসী মাত্রই ম্লেচ্ছ, ওদের নিশ্চিহ্ন কর দেশ থেকে। কার্ডিফ্-এর কাগজ বলছে না, দেশটা ছিল আমাদের, থাকবে আমাদেরই, বিদেশী ইংরেজকে মেরে

তাড়াও চ্যানেল-এর ওপারে। আমাদের দেশের খবর-কাগজ-গুলি সাধারণত এ-তুলনায় বেশী সজীব এবং সতেজ। তার ফলে আমরা প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রাণ দিয়ে থাকি।

ইংরেজ জাতির গুণকীর্তন অনেক করা হল। বলা বাহুল্য, তার মানে এ নয় যে দোষ এখানে চোখে পড়ে না। চুরি জোচ্চুরি নিষ্ঠুরতা অভদ্রতা দুর্নীতি সবই আছে এদেশে—যেমন আছে সব দেশে। প্রথম যখন এখানে আসি এক বন্ধু বলেছিলেন এই ধরণের দৃষ্টান্তগুলি টুকে রাখতে নোট-বইতে। আমার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হয়ে উঠে নি। শেষে বন্ধু নিজেই নেমেছিলেন কাজে। তার খাতার থেকে বেছে বেছে কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। এতে হয়তো 'ছবি'টা সম্পূর্ণ হবে।

"আজ লায়ন্‌স-এর রেস্তরাঁ থেকে অমুকের আনকোরা নতুন রেইন-কোটটা চুরি গেল। বেচারা সবে ওটা খুলে রেখে লাইনে দাঁড়িয়েছে, ফিরে তাকিয়ে দেখে—নেই। কে গাএ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বেচারা অমুক এ-বাজারে এতগুলি কুপন কোথায় পায় বল তো।"

"আজ এক ট্রেনের কামরায় দেখলাম পেনসিলে আঁকা কতগুলি অশ্লীল চিত্র,—ঠিক যেমন দেখা যায় আমাদের দেশের সার্বজনীন পায়খানা ইত্যাদিতে। আশ্চর্য লাগলো

কারণ এমন জিনিস এদেশে আর দেখি নি। তবু মনটা বেশ লাগছে—এই 'সভ্য' দেশেও এসব আছে তাহলে।"

"কাল সেল্‌ফ্রিজ-এর দোকানে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ছোটদের ছবির বই গোটাকয়েক কিনেছি, দেশে পাঠাবো বলে'। একটি পাঁচ-ছ' বছরের মেয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দেখে তাকে দেখতে দিলাম একখানা বই। অদূরে ছিল তার মা, যাবার সময়ে ডাকলে মেয়েকে। মেয়েটা বইখানা নিয়েই সুড়সুড় করে' বেরিয়ে গেল! মা দেখেও দেখলে না। সে কি ভেবেছে আমি বইটা দিয়ে দিয়েছি! তা যদি ভাবতো তাহলে নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাতো আমাকে। এ স্রেফ চুরি ছাড়া কিছু নয়। আমি এত হতভম্ব যে মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরলো না।"

"মিঃ বার্নেট-এর বড় বড় কথা আমি কোনো দিন বিশ্বাস করি নি,—সেটা যে ভাল করেছি সম্প্রতি তার প্রমাণ পেলাম। সর্বজাতি-সম্প্রীতি-সমিতির উনি সেক্রেটারি —দেখাতে চান নিজে মস্ত আদর্শবাদী। আমাকে বলছিলেন গোপনে: তোমরা ভারতীয়রা কাফ্রিদের অনেক উপরে। পরে শুনলাম এক আফ্রিকান বন্ধুর

কাছে, তাকে বলেছেন যে ভারতীয়রা ইংরেজ-বিদ্বেষী, সুতরাং কাফ্রিরা তার অনেক বেশী প্রিয়।···প্যারিস থেকে যে-তিনটি মেয়ে বেড়াতে এসেছিল সেদিন নাচের পার্টিতে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এসে আমাদের সঙ্গে নাচতে কোনো দোষ দেখেনি, তাদের ডেকে বলে' দিলেন কানে কানে, কালা আদমীর সঙ্গে মাখামাখি করে এটা তার পছন্দ নয়।"

হ্যাঁ, এদের মধ্যেও সব রকম দোষই দেখা যায়। তবে আমাদের তুলনায় অনেক কম। সেটাই বড় কথা।

BIR BIKRAM COLL... LIBRARY